১. শিল্পী ও মিস্তিরি

আমার দীর্ঘদিনের চিত্রকর বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরী একবার একটি কথা বলেছিলেন— আমরা মিস্তিরি মানুষ; এ বাড়িতে পোষালো না, র‍্যাঁদা-করাত-বাটালি চটের থলেতে পুরে আরেক গেরস্তর বাড়ি যাবো। কাইয়ুম আর আমি একসঙ্গে বহু পত্রপত্রিকা আর প্রকাশকের বাড়িতে কাজ করেছি; কাজ নিয়ে একবার একজনের সঙ্গে খটাখটি লাগলে, আমি মন খারাপ করলে, ঐ কথাটি তিনি বলেছিলেন।

সত্যি বৈকি— খাঁটি সত্যি কথা।

শিল্পের গাড়ি নিছক প্রেরণার চাকায় চলে না। তিনি গায়ক হোন, লেখক হোন কি চিত্রকর, তাঁর ভেতরে নিদ্রাহীন দুই পুরুষ— প্রতিভাবান শিল্পী আর নিপুণ মিস্তিরি।

মিস্তিরির দিকটা বুদ্ধিনির্ভর, আর শিল্পীর দিক দৃষ্টিনির্ভর। দৃষ্টি আর বুদ্ধি, এ দু'য়ের রসায়নে হয় একটি ছবির জন্ম, কি একটি কবিতার। দৃষ্টি দিয়ে যা আয়ত্ব করলাম বুদ্ধি দিয়ে তা পৌঁছে দিলাম। অধিকাংশ শিল্পচেষ্টাই যে শেষপর্যন্ত পৌঁছোয় না তার পেছনে, আমি মনে করি, ঐ মিস্তিরির অভাব।

একটি উপমা আমি প্রায়ই দিয়ে থাকি— চেয়ারের চারটে পা যদি মেঝেতে ঠিকমতো না-ই বসলো তো সে চেয়ার দেখতে যতই মনোহর হোক আমার তাতে কাজ নেই। চেয়ার বসবার জন্যে। মেঝের ওপর জুৎ মতো সেটি বসতে হবে, তার পা চারটে স্থির মতো থাকতে হবে, কোথাও এতটুকু টলমল করবে না -তবে সে চেয়ারে আমি বসবো। বসে তারপর দেখব আসন কতটা আরামদায়ক, পিঠ কতটা সুখপ্রদ। সে সব হলো তো দেখব চেয়ারটির নকশা কেমন, পালিশ কেমন, সবশেষে যাচাই করব টেকসই কতদূর। তবেই সে চেয়ার হবে আমার চেয়ার।

লেখা সম্পর্কেও আমার একই দাবী। লেখাটি মিস্তিরির হাতে ঐ চেয়ারের মতো পাকাপোক্ত হতে হবে। কবিতা হলে ছন্দের নির্ভুল ব্যবহার আমি দেখতে চাই; ছন্দ নির্ভুল তো আমি দেখব কবিতার অন্তর্নিহিত যে যুক্তির সিঁড়ি সেটি আছে কি না; থাকলে সে সিঁড়ি কতটা মজবুত। তারপর দেখব কবিতায় বলবার কথাটি জ্যামিতিক সম্পূর্ণতা পেয়েছে কিনা। এই জ্যামিতিক সম্পূর্ণতা বলতে বোঝাতে চাচ্ছি ত্রিভুজ কিংবা বৃত্ত অথবা আয়তক্ষেত্রের বা বর্গক্ষেত্রের তৃপ্তিকর একটি নির্মাণ। ছোট্ট করে এখানে বলে নিতে পারি যে, দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা ছাড়া মানুষ যে কিছুই আলিঙ্গন করতে পারে না মানুষের এ এক অলঙ্ঘ্য সীমাবদ্ধতা। আর তাই আমার কল্পনায় মানুষের যে কোনো সৃষ্টিশীল উচ্চারণ হয় বৃত্ত অথবা আয়তক্ষেত্র কিংবা ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

কবিতায় মিস্তিরির হাত চৌকশ দেখতে পেলেই আমি কবিতাটি কবিতা কিনা বিচার করতে

বসবো। বলতে হবে না, মিস্তিরির কাজটুকু কবিতা নয়। আগে যে দৃষ্টির কথা বলেছিলাম, শিল্পীর সেই দৃষ্টিই রচনাটিকে এবার হয় কবিতা করে তুলবে অথবা তুলবে না। যদি না তোলে তো বড়জোর সাময়িকপত্রের একাংশ পূরণ করবার যোগ্যতা স্বীকার করে নেব মাত্র; আর যদি কবিতা হয়, যদি এমন করে এই কথাটি আর কেউ বলে না থাকে তো সে কবিতাকে সাময়িকপত্রের পাতা থেকে তুলে এনে অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করে নেব, কিংবা কবিতাটি নিজেই তার প্রবল শক্তিতে আমার অন্তর্গত হয়ে যাবে।

আসলে যে কোনো ভালো লেখাই পাঠককে পরাস্ত করে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

আমার স্মরণ হচ্ছে আমি কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লিখে থাকি। শুরুতেই কবিতার কথা তুলে কি কবিতার প্রতি আমার গোপন পক্ষপাতটুকু প্রকাশ করে ফেললাম। গোপন কেন?— এ পক্ষপাত তো প্রকাশ্য। আমি কি আমার প্রিয়তম ব্যক্তিটিকে উপন্যাসের চেয়ে কবিতার বই দিতে ভালোবাসি না? আমাকে কবি বলে পরিচয় করিয়ে দিলে কি আমি অধিকতর কৃতজ্ঞ বোধ করি না?

ব্যক্তিগত থাক; আমার সিদ্ধান্ত –সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে যিনি কাজ করেন একই সঙ্গে, তিনি যদি কবিতাও লেখেন, তা তিনি যত কমই লিখুন আর তাঁর কবিতা তুলনামূলকভাবে যত কম গ্রাহ্যই হোক না কেন, তিনি কবি এবং কবি ছাড়া আর কিছু নন। কবি বলেই তিনি নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই পল্লীসংস্কারক পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। ডি এইচ লরেন্স কবি না হলে ঔপন্যাসিক নন।

কবিতার কথা তুলেছি, কারণ একটি সদ্যক্ষত আমি বহন করছি। কিছুদিন আগে আমাদের প্রধান এক তরুণ কবি আমাকে তাঁর নতুন লেখা ছোট্ট একটি কবিতা দেখিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করি, এই কবি যাঁর বেশ কয়েকটি বই আছে, বাংলাদেশে সাহিত্যপাঠক প্রায় প্রত্যেকেই যাঁর কবিতা না হোক নামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর এই বারো লাইনের কবিতায় ছন্দটি নির্ভুল নয়। বিশেষ করে একটি লাইনে ছন্দের শোচনীয় পতন আমাকে দ্বিখণ্ডিত করে যায়। স্বীকার করব, দশ বছর আগে হলে কবিতাটি কবির হাতে নীরবে ফিরিয়ে দিতাম; কিন্তু এখন সুকুমার রায়ের সেই নব্বুই বছর বয়সী নাজিরের মতো আমিও ভাবি— একদিন তো মরবই, অতএব মন্ত্রীর জামা শুঁকে দেখতে ভয় কিসের? কবিকে ছন্দের ভুলটা দেখিয়ে দিতে, আরো অবাক, তিনি বললেন, এ ভুল তাঁর নতুন নয়, তাঁর বিভিন্ন বইতেও এ ধরনের পতন রয়ে গেছে এবং এখন তিনি আর কিছু মনে করেন না।

না, পারি না, আমি ভাবতেও পারি না, একজন কবি যদি তিনি কবি হন, এই অনুতাপবর্জিত উচ্চারণ তাঁর, এই অকুণ্ঠিত মুখ ঠিক তাঁরই।

মিস্তিরি শিল্পী নন, কিন্তু প্রতিটি শিল্পীই নিপুণ মিস্তিরি। যে চেয়ারের পা টলমল করছে, পিঠ খোঁচা দিচ্ছে, তার নকশা যত নতুনই হোক, ঘরে দিন দুয়েক রাখবার পর গৃহস্থ তাকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে চাতালে, অবশেষে বিস্মৃতির গুদামে ফেলে রাখবেনই। মহাকাল নির্মম এক গৃহস্থ; তিনি এইসব আপাত-মনোহর আসবাব জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

২. তরতর করে লিখে ফেলা

লঘুকণ্ঠে আমি অনেকবার এ রকম একটি কথা বলেছি যে, লেখাটা কোনো কঠিন কাজ নয়, যে কেউ লিখতে পারেন, কঠিন হচ্ছে, লেখাটিকে একটি পাঠের অধিক আয়ু দান করা। যে লেখকের গল্প বা উপন্যাস এখন আর তেমন পড়াই হয় না, সেই সমারসেট মম, লেখার মিস্তিরির দিক নিয়ে বিস্তর লিখেছেন এবং তাঁর একটি চাঞ্চল্যকর মত হচ্ছে, যে কেউ কাগজ কলম নিয়ে বসলেই অন্তত একটি উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন, আর সে উপন্যাসটি তাঁর নিজের জীবন নিয়ে উপন্যাস। এই যে আমি বলি 'যে কেউ লিখতে পারেন,' আর মম বলেন, 'যে কেউ অন্তত একটি উপন্যাস লিখতে পারেন'—এই 'লেখা'টাও কিন্তু নিতান্ত কাগজ-কলম টেনে নেবার অপেক্ষা করে না মাত্র, এইটুকু কর্তব্য সাধনের জন্যে বিস্তর পরিশ্রম ও প্রস্তুতির দরকার হয়।

আমার এক ফুপা আছেন, তিনি বর্ধিষ্ণু কৃষক এবং তাঁর অঞ্চলে তিনি বৈষয়িক বুদ্ধি ও নেতৃত্বের জন্যে সম্মানিত পুরুষ, তিনি মনে করেন, যেমন অধিকাংশ লোকই মনে করে থাকেন, লেখার জন্যে একটা পরিবেশ পেয়ে যাওয়াই যথেষ্ট এবং সে পরিবেশটি যদি নৈসর্গিক হয়, তাহলেই সর্বোত্তম, এবং তাঁর ধারণা, বহু চিঠিতে তিনি আমাকে অতীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি তাঁর বসতবাড়ির বাহির প্রাঙ্গণের বিশাল জামগাছ তলায় খালের দিকে মুখ করে যদি বসি, তাহলে আমার হাত থেকে তরতর করে লেখা বেরুবে। লেখার জন্যে যে অভিজ্ঞতা, দৃষ্টি আর স্পষ্ট বিশ্বাসের দরকার হয়, এবং সেটাও যে রীতিমত অর্জন করে নিতে হয়— সে কথায় না গিয়ে ঐ তরতর করে লিখে ফেলার বিষয়ে বরং কিছু বলা যাক।

তরতর করে লিখে ফেলা? বাক্যবন্ধটি যতই তরল শোনাক, ব্যাপারটি গুরুতর। বহু মাননীয় লেখক আছেন, প্রচুর লিখেছেন এমন লেখক অনেকেই আছেন, যাঁরা বড় ধীরে লিখেছেন, দিনমানে এক দু' পৃষ্ঠার বেশি এগুতে পারেননি, এবং একটি উপন্যাস—তাও ছ'সাত শ' পৃষ্ঠার—একাধিকবার লিখেছেন। আবার এমন লেখকও আছেন, যাঁরা যখন কাগজ-কলম নিয়ে বসেন, ব্রহ্মপুত্রের সাবলীলতা নিয়ে এগিয়ে যান, মিনিট পার হতে না হতেই পুরো একটি স্তবক রচিত হয়ে যায়, দিনমানে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে যায়, পাণ্ডুলিপি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—প্রায় কোনো কাটাকুটি নেই, আয়াসের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। যেন তিনি নতুন করে কিছু লেখেননি, কোনো লেখা দেখে নকল করে গেছেন মাত্র।

আসলে, এই দু'জাতের লেখক লেখার দুই বিভিন্ন অভ্যেসে অভ্যস্ত। একজাতের লেখক ভাবতে ভাবতে লেখেন, লিখতে লিখতে ভাবেন, তাঁদের মনের ভেতরে চিন্তার ভেতরে লেখাটি ভাস্কর্য-সম্ভব এক মার্বলখণ্ড হিসেবে তাঁরা যখন ধারণ করে নিতে সক্ষম হন, তখনই কাজে বসে যান এবং ছেনি-হাতুড়িতে ঠুকে ঠুকে রূপ সৃষ্টি করতে থাকেন, একটু বা করেন...থেমে যান...পিছিয়ে দাঁড়ান...দ্যাখেন.... আবার কাজ করেন...আবার থামেন...আবার ভাবেন...আবার সক্রিয় হন...এমনকি, কাজ করতে করতে নিজেই অনুভব করেন, এটুকু ঠিক এভাবে হবে না, তবু এভাবেই কিছুদূর এগিয়ে যান এবং পরমুহূর্তে নিজেই তা বাতিল করে দেন—যেন, বাতিল করবার জন্যেও তাঁদের পক্ষে

দরকার হয় বাতিল-যোগ্য অংশটি পরিস্কারভাবে দেখে নেবার, তাই এ জাতের লেখকের কলম চলে ধীরগতিতে, তরতর করে মোটেই নয়, চারদিক দেখে-শুনে, আস্তে-সুস্থে।
আরেক জাতের লেখক, যাঁরা দ্রুত লেখেন, তাঁদের অভ্যেস লেখাটি পুরোপুরি করোটিতে এনে, বস্তুতপক্ষে করোটির ভেতরেই লেখাটি সম্পূর্ণ করে তবে কাগজ-কলম নিয়ে বসা। এঁরা করোটির ভেতরেই পূর্বাহ্নে কাটাকুটি করেন, গ্রহণ-বর্জন করেন, সমালোচকের চোখে বারবার অবলোকন করেন এবং যখন সব তাঁর মনের মতো মনে হয়, তখনি কেবল কাজে হাত দেন। ফলে, এঁদের পাণ্ডুলিপি এত পরিচ্ছন্ন, প্রতারকভাবে এতটা অনায়াসসিদ্ধ। বলে দিতে হবে না যে, এই দু'জাতের লেখকই একটি কাজ কিন্তু অবশ্যই করে থাকেন, আর তা হলো সচেতনভাবেই তাঁরা সৃষ্টি করেন— গ্রহণ, বর্জন, কাটাকুটি, এ সবই সেই সচেতন ক্রিয়ার প্রমাণ। তফাতটা এই যে, কাজটা কেউ করোটির ভেতরে করেন, কেউ কাগজের পৃষ্ঠায় করেন। আবার এর ভেতরেও ঊনিশ-বিশ আছে, যেমন জীবনের সবক্ষেত্রে আছে, কেউ কাজটা তাড়াতাড়ি করতে পারেন, কেউ একটু ধীরে।
আমি নিজে দ্বিতীয় রীতিতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ, লেখাটি পুরোপুরি মাথায় না এনে, প্রায় কমা-সেমিকোলন সমেত, লেখার টেবিলে বসতে পারি না, এবং এরপরও আমাকে প্রায়ই দ্বিতীয় খসড়া করতে হয়—উপন্যাসের, গল্পের। গল্প-উপন্যাসের বেলায় আমার হাত দ্রুত এবং সাবলীলভাবে কাজ করতে পারলেও, গল্প-উপন্যাস কিন্তু দ্রুত বা অনায়াসে আমার মাথায় আসে না, দু'আড়াই বছরের আগে তো কোনো গল্প বা উপন্যাসই মনের মধ্যে দানা বাঁধেনি, অধিকাংশ লেখাই গড়ে অন্ততঃ বছর চার-পাঁচ ধরে নাড়াচাড়া করে তবে লিখতে বসেছি, আমার একটি উপন্যাস তো এখনো লেখাই হলো না, যেটি নিয়ে আমি সেই ঊনিশশো তেপান্ন সাল থেকে ভাবছি, এখনো মাঝে মাঝেই নাড়াচাড়া করি এবং প্রতিবারই আশা করি যে, এবার হয়ত লেখার টেবিলে ওটা নিয়ে বসতে পারব।
কবিতার বেলায় দশ পনেরো খসড়া হামেশাই আমাকে করতে হয়—এবং কবিতার বেলায় আমার যেটা ঘটে, তাৎক্ষণিক কিছু কিছু পংক্তি সব সময়ই আমি কাগজে ধরে রাখি, একটা ব্রাউন রঙের বড় খামে সেগুলো জমতে থাকে, আর নিয়মিত আমি সেই পংক্তিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি; এক সময়ে আবিষ্কার করি যে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ, হয়ত বহু দিনের ব্যবধানেই লেখা কয়েকটি অংশ, একটি সম্পূর্ণ ভাবনার বৃত্তে সহজেই স্থাপিত হতে পারছে; তখন সেই পংক্তিগুলো নিয়ে আমি প্রথম খসড়া তৈরী করি এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে ফেলে রেখে দিয়ে, আবার একদিন ওটা নিয়ে কাজ করতে বসি; এই দ্বিতীয় উপবেশনেই খসড়ার পর খসড়া করে যেতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না রূপটি চূড়ান্ত বলে নিজের কাছেই মনে হয়। আবার বহু বৎসর পরে আমি অনেক কবিতারই নতুন একটি পাঠ রচনা করে ফেলেছি এটা লক্ষ করে যে, আমার সর্বাধুনিক চোখে মানুষ ও বিশ্বকে যেভাবে দেখছি, তার সঙ্গে পুরনো পাঠ আর তেমন সংগতিপূর্ণ নয়; হয়ত নতুন একটি কবিতা লেখা যেত। হয়ত অনেকেই বলবেন যে, পুরনো কবিতা অক্ষত রেখে দিলে ভাবনার ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ্য করা সম্ভব হতো; কিন্তু না, আমার কবিতার কাজ ওভাবেই, আমার কবিতা আমাকেই অস্বস্তিতে ফেলে দেয় বারবার ওভাবেই, আর ওভাবেই আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করি বারবার।
নাটক লিখেছি সংখ্যায় খুব কম; পাঁচটি কাব্যনাট্য এ পর্যন্ত, তাই এখনো জোর দিয়ে

বলতে পারছি না, নাটকের বেলায় আমার অভ্যেসটা শেষ পর্যন্ত কি ধরনের হয়ে দাঁড়াবে; তবে, এই পাঁচটি লেখাই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে তৃতীয় খসড়ায় পৌঁছে; আসলে, দুটি খসড়া; তৃতীয় খসড়াটি সম্পূর্ণভাবে অভিনয়-যোগ্যতার পরীক্ষাতেই সীমিত।
কথা তুলেছিলাম তরতর করে লিখে ফেলার ব্যাপারে। তরতর করে লিখে ফেলা? বাক্যবন্ধটি যতই তরল শোনাক, ব্যাপারটি গুরুতর, এ কথাও বলেছি। কিন্তু একজন লেখককে তরতর করে লিখতেই হবে, নইলে তিনি লেখকই নন, কিংবা লেখক মাত্রেই তরতর করে লিখতে পারেন, এর কোনোটিই সত্যি নয়। বা এর কোনো গুরুত্ব নেই। যে লেখাটা রূপ পেল সেই লেখাটিই বিবেচ্য; কি গতিতে বা কি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা লেখা হলো, সেটা নিতান্তই আকস্মিক ও প্রভাবহীন ব্যাপার।

৩. মারাত্মক গুজব

এটা যে কতখানি আকস্মিক ও প্রভাবহীন ব্যাপার, তার প্রমাণ হিশেবে কয়েকটি তুলনা উপস্থিত করছি। শুনেছি, দস্তয়েভস্কি মনে করতেন, তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নেই, যেভাবে সময় নিয়ে গুছিয়ে বসে তিনি লিখতে চান, তা আর এ জীবনে হবে না; অতএব তিনি দ্রুত লিখেছেন এবং লেখাগুলোকে নিতান্ত একটি খসড়া বলে বিবেচনা করেছেন।
আবার আমরা শুনেছি, টমাস মান লিখতেনই
ধীরগতিতে, তার ওপর লেখা শেষ হয়ে গেলে তাঁর ধারণা হতো, কিছুই হলো না এবং তখন আবার লিখতে শুরু করতেন; দশ বারো বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন একটি উপন্যাস নিয়েই কাজ করে যাওয়াটা তিনি খুব স্বাভাবিক মনে করতেন। দু'টি উপন্যাসের ভেতরে, একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি যুগ কলম বন্ধ করে রেখে দেন; একটি উপন্যাস শেষ করে, সে রাতেই এবং সেই পৃষ্ঠারই শাদা অংশে পরবর্তী উপন্যাস শুরু করেন একজন আলেকজান্দার দুমা। স্বপ্নদংশিত ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো একজন ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স কলমের আঙুলে চিন্তার গতির সঙ্গে পাল্লা রাখতে পারেন না, এক মুহূর্তে তাঁর করোটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডজন বাক্য এবং লেখা হতে না হতেই আরেক ডজন; আবার, ভাস্কর্যশিল্পীর মতো কায়িক অর্থে শ্রমিক ও অধ্যবসায়ী একজন কমলকুমার মজুমদার কখনো কখনো একটিমাত্র বাক্য রচনাতেই ব্যয় করেন একটি সপ্তাহ, কখনো কখনো একটি মাস, এমনকি জীবনের প্রথম উপন্যাসও তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আবার হাতে নেন এবং ফাঁক পেলেই বইয়ের মার্জিনে একেকটি বাক্যের নতুন রূপ দিতে থাকেন।
এই কথাগুলো যে আমাকে বলতে হলো, তার একটিই কারণ; আমাদের দেশে এ রকম গুজব চালু আছে যে, বসলেই লেখা হয়ে যায় এবং উপন্যাস তো ঈদের মৌসুমে ফরমায়েশ পেয়েই লেখকেরা দু'চারদিন দরোজা বন্ধ করে বা আপিস ছুটি নিয়ে লিখে ফেলেন—কখনো কখনো একাধিক উপন্যাসও একই সপ্তাহে রচিত হয়ে যায়। গুজবটা দানা বাঁধে, যখন দেখা যায় যে, এই ঈদের মৌসুমেই পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে যাঁর লেখা দেখা যাচ্ছে, বছরের অপর সময়ে তাঁর লেখা দেখা দেখা যায় না, বা সম্পাদকেরা চেয়েও পান না। আর, এ গুজব সমর্থিত হয়ে যায় যখন সম্পাদনা কর্মীদের

মুখেই গল্প শোনা যায় যে, অমুখ লেখক তো তিনদিনে উপন্যাস শেষ করেছেন। শুধু মৌখিক গল্প কেন? সাগরময় ঘোষ কি তাঁর বইয়ে লেখেননি যে, সুবোধ ঘোষ পত্রিকার আপিসে বসে, রাত জেগে, পারব-না-পারব-না বলেও, ঘুমহীন রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে 'জতুগৃহ'-র মতো প্রথম শ্রেণীর একটি গল্প লিখেছেন, দু'তিনটি বাক্য লিখেছেন; আর কম্পোজিটর এসে নিয়ে গেছে অক্ষর সাজাতে, এইভাবে রচিত হয়েছে এক বিস্ময়? আমার তো মনে হয়, অচিরেই বাংলাদেশে কোনো সম্পাদক এ ধরনের স্মৃতিকথা প্রকাশ করবেন এবং আমরা জেনে যাব, কিভাবে অমুক লেখককে দিয়ে তাঁর অমুক প্রধান রচনাটি, বলতে গেলে তিনিই জোর করে, এক অসম্ভব পরিস্থিতির ভেতরে লিখিয়ে নিয়েছেন এবং লিখিয়ে নিয়েছেন ঈদ সংখ্যা প্রকাশের শেষ তারিখের ঠিক আগের দিন, অথবা ঘন্টাটিতে।

আমার রীতিমত ভয় হয়, এইসব গল্প এবং গুজব এরি মধ্যে অনেক তরুণ বা নতুন লেখককে প্রভাবিত করে ফেলেছে; আমার সন্দেহ হয়, এই রাতারাতি উপন্যাস নামানোটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যেন এটা না করতে পারলে লেখকই হওয়া যাবে না, লেখক বলে কেউ খাতির করবে না। এই ভয় এবং এই সন্দেহ নিতান্ত অনুমানের ওপর প্রকাশ করছি না; চারপাশ থেকে এখনি আমি কিছু শুনি এবং কিছু নিজের চোখেও দেখেছি।

বড় লেখকের লেখা থেকেই কেবল আমরা শিখি না, অনেক সময় তার ব্যক্তিগত জীবন, আচরণ ও অভ্যেসও আমরা অনুকরণ করি প্রাথমিক অবস্থায়; এটা বরাবর হয়ে এসেছে, এদেশে ও বিদেশে; এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেবল ঈদের মৌসুমেই লেখা, কেবল চাপের মুখেই লেখা, কেবল চট করেই লেখা, এ সব গল্প আর গুজব নতুন ও তরুণ লেখকদের মধ্যে যদি ছড়িয়ে পড়ে, যদি অনুসৃত হয়, তাহলে সাহিত্যের কাননের বদলে সাহিত্যের গোরস্তানই আমরা রচনা করব।

আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথ এবং তিনি একটি কলেজে ছাত্রদের পড়াতেন, ছেলেবেলায় বহুদিন তাঁর ক্লাশের দরোজার বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতাম। বাবা ছাত্রদের পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে সরস গল্প বলতেন এবং তাঁর মুখে শোনা একটি গল্প এখন আমার মনে পড়ছে। প্রবীণ এক ডাক্তারের নবীন এক কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে গল্প। কম্পাউণ্ডার রোজ দ্যাখে যে, ডাক্তার সাহেব রোগীর রোগ বর্ণনা শোনেন চোখ বোঁজা অবস্থায় উদাস ভঙ্গীতে, যেন ভালো করে শুনছেনই না, যেন অন্য কিছু ভাবছেন, তারপর এক সময় হঠাৎ তিনি জেগে উঠে হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা ওষুধের বাকসো থেকে ভালো করে না দেখেই একটি ওষুধ বার করে রোগীকে দেন; রোগীটি পরদিন এসে নিরাময় হয়ে যাবার সুসংবাদ জানিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডার ভাবল, আরে, ডাক্তারি করা এত সোজা? তাহলে আর আমি কম্পাউণ্ডারি করছি কি করতে? সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, এক বাকসো ওষুধ কিনে সোজা চলে গেল তার গ্রামে; এবং সেখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বসে গেল প্র্যাকটিস করতে। অচিরেই প্রবীণ ডাক্তার খবর পেলেন, তাঁর প্রাক্তন কম্পাউণ্ডারটি বিষ প্রয়োগে মানুষ খুন করবার দায়ে সদরে চালান হয়েছে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, রোগীর রোগ-বর্ণনা সে শুনেছিল তাঁরই মতো চোখ বুঁজে এবং হাতের ডগায় যে ওষুধ উঠে এসেছিল, সেটাই দিয়েছিল রোগীকে, আর সে শিশিতে ছিল তীব্র বিষ।

আমার বাবা তাঁর ছাত্রদের মনোযোগী এবং সাবধানী হবার জন্যে ভঙ্গীর পেছনে যে অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে গল্পটি বলেছিলেন। কিঞ্চিত পরিবর্তন করে নিলে গল্পটির সত্য এ ক্ষেত্রেও আমি ধরিয়ে দিতে পারি।

৪. লেখা শেখা

পেছনের দিকে তাকিয়ে এখন শিউরে উঠি যে লেখার কৌশল কতখানি কম জেনে—আরো ভালো, যদি বলি কিছুই না জেনে, একদা এই কলম হাতে নিয়েছিলাম। লেখা যেহেতু কোনো একটি ভাষায় লেখা, এবং যেহেতু সেই ভাষা আমরা শিশুকাল থেকেই, জন্ম বোবা না হলে, অস্তিত্ব যাপনের জন্যে অনবরত ব্যবহার করে থাকি, তাই শিল্পের প্রয়োজনে যে এই ভাষা নামক উপাদানটিকে সম্পূর্ণ নতুন করে, দৈনন্দিন ব্যবহার পদ্ধতি ও ব্যবহারের যুক্তি থেকে একেবারে আলাদা করে দেখে নিয়ে কলম ধরতে হয়—তা আমাদের, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বারও মনে হয় না। যেন আমরা এই ক্ষেত্র থেকে শুরু করি যে, কথা যখন বলতে পারি, চিঠি যখন লিখতে পারি, তখন কাগজ কলম নিয়ে বসলে একটি গল্প বা কবিতাও লিখে ফেলতে পারব। কবিতার ব্যাপারে হয়ত একটুখানি সচেতন চেষ্টার দবকার হয়, কারণ কবিতায় আছে ছন্দ, আর সেই ছন্দ ঠিক প্রতিদিনের উচ্চারণে ব্যবহারযোগ্য নয়, তবু, যে লেখক কবিতার দিকে প্রথম হাত বাড়ান তিনিও ঠিক ছন্দ জেনে নয়, বরং অতীতে পড়া, সম্ভবত বিদ্যালয়ে পড়া, কোনো কবিতার ছন্দকে আঁধারে হাত বাড়িয়ে তার শরীর অনুমান করে নিয়ে সেই শরীরেই শব্দ সাজিয়ে নেন; হয়ত এই কারণেই দেখা যায় যে, যে কোনো কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলো তার ঠিক আগের সময়ের বা সমকালের সবচেয়ে ব্যবহৃত ছন্দেই লেখা।

কিন্তু, আগেও যেমন একাধিকবার বলেছি, লেখা যদি হতো ছবি আঁকা কিংবা মূর্তি গড়া অথবা গান গাইবার মতো কোনো উদ্যম, তাহলে এতটা নিশ্চিন্তে এতটা কম সচেতন হয়ে আমরা পা বাড়াতে পারতাম না; অন্তত ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া বা গান গাইবার জন্যে রং তুলি, হাতুড়-ছেনী বা হারমোনিয়াম নিয়ে যতটুকু পাঠ এবং রেওয়াজ এবং আরো বড় করে যতটুকু সাধ্য সাধনা করা দরকার তা করে নিয়েই কাগজে কলম ছোঁয়াতাম।

যুক্তিবিজ্ঞানে যাকে বলে 'ভ্রান্ত সাদৃশ্যমূলক অনুমান'—জীবনে আমরা তার শিকার হই বড় নির্মমভাবে; আর এ জন্যেই আমরা এই কথাটিতে সম্পূর্ণ আস্থা রাখি, এর ভেতরে আদৌ কোনো ফাঁক দেখি না, যে, জলে নেমেই সাঁতার শিখতে হয়। সাদৃশ্যমূলক এই অনুমানটিকেই ব্যবহার করে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি যে, লিখতে শুরু না করে লেখা সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়, কিংবা লিখতে লিখতেই লেখক হওয়া যায়। ধরুন, এই অনুমানটিকে আরো সম্প্রসারিত করে আমি যদি মহাশূন্যে যাত্রার উদাহরণ তুলে ধরি? তাহলেও কি 'জলে না নেমে সাঁতার শেখা যায় না' এই বচনটির সত্যতা আপনি মেনে নেবেন? ইচ্ছে থাকলেও পারবেন না। তার কারণ, জল আর মহাশূন্য ঠিক এক জিনিস নয়। মহাশূন্য সম্পর্কে সম্ভবপর সমস্ত তথ্য না নিয়ে, মহাশূন্যের বায়ুহীন অবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ু সঙ্গে না নিয়ে, মহাশূন্যের কল্পনাতীত উত্তাপ ও

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার মতো পোশাক না পরে এবং এইসব আয়োজন সম্পর্কে ষোলআনা নিশ্চিত না হয়ে আপনি কিছুতেই নভোলোকে যাত্রা করতে পারেন না, পারবেন না। কাজেই এ ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, মহাশূন্যে না গিয়ে কেউ মহাশূন্য ভ্রমণ রপ্ত করতে পারে না।

এখন, লেখার ব্যাপারটিকে যদি মহাশূন্যে যাবার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত এসে যায় যে, লেখার আগে লেখার কৌশল আমাদের পুরোপুরি জেনে নিতে হবে। কিন্তু, আরেক দিক থেকে এটাও একটি ভ্রান্ত সাদৃশ্যমূলক অনুমান। কারণ, এই দুটো উদ্যমের মৌলিক লক্ষ্যই ভিন্ন, তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাত নিয়ম মানতে হয় এবং অজ্ঞাত নিয়মটাও বৈজ্ঞানিককে আবিষ্কার করে নিতে হয়, কোনো নিয়ম নিজে নির্মাণ করে চাপিয়ে দেবার তার কোনো উপায় নেই; অন্যদিকে একজন লেখককে জ্ঞাত নিয়ম জেনে নিতে হয় বটে কিন্তু তিনি নিজেও কিছু নতুন নিয়ম নির্মাণ করতে পারেন। আর যেহেতু তিনি নিজেই কিছু নতুন নিয়ম নির্মাণ করতে সক্ষম, তাঁর কাজের প্রকৃতিই তাই, অতএব একজন লেখককে সেইসব অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তাঁকে যেতে দিতে হয়, যেখানে তিনি কখনো ভুলপথে চলছেন, কখনো আঁধারে হাঁটছেন, আবার কখনোবা মেঘহীন পূর্ণিমায়। এ যদি না হয়, তাহলে শামসুর রাহমানের বদলে বাংলাভাষার সবচেয়ে বড় কোনো পণ্ডিত আমাদের সমকালের বড় কবি হতেন।

সত্যটা আসলে মাঝখানে। লেখার আগে লেখা সম্পর্কে জ্ঞাত কিছু নিয়ম, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোঁজ রাখতে হবে, যা রাখার উপায় হচ্ছে সচেতনভাবে পড়ে যাওয়া, অনবরত পড়ে যাওয়া; জানতে হবে ভাষার গঠন, তার ব্যাকরণ, বুঝে নিতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার দূরত্ব—আমার মতে যে দূরত্ব না থাকলে বা রক্ষা করতে না পারলে লেখাই সম্ভব নয়; তারপর লেখায় হাত দিতে হবে।

শোচনীয়ভাবে লক্ষ করি, আমি অন্তত আমার জীবনে এই সূত্র রক্ষা করতে পারিনি। একেবারেই কিছু না জেনে, ভাষা সম্পর্কে একেবারেই অচেতন থেকে, দূর দুর্গম এক দ্রষ্টেব্যের দিকে ষোলো বছর বয়সে যাত্রা শুরু করি। তার মাশুল দিতে হয়েছে এবং এখনো দিতে হচ্ছে পদে পদে, পথের প্রতি মোড়ে, রাত নেমে এলে শীতখণ্ডিত খোলা প্রান্তরে।

৫. প্রতিদিনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা

সত্যিকার অর্থে যিনি লেখক তিনি ছাড়া আর প্রায় সকলেই প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার কোনো রকম ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন না। শামসুর রাহমান যখন প্রতিদিনের শব্দ ব্যবহার করে লেখেন, 'বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তী, ভদ্রপাড়া আর/ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে/দাঁড়ালাম। কাঁচের আড়ালে দেখি কাঠের পুতুল/রেলগাড়ি, ছক-কাটা বাড়ি, আরবী ঘোড়া এক জোড়া/উড়ন্ত পাখির মতো এরোপ্লেন, টিনের সেপাই।/ভালুক বাজায় ব্যান্ড, বাঁকা শিং হরিণের পাশে/বাঘের অংগার জ্বলে, বিকট হাঁ করে আছে সিংহ/সারি সারি রয়েছে সাজানো ওহো হরেক

রকম/বাজনা বাঁশি বাদশা বেগম আর উজির নাজির।' আমরা ভাবতেও পারি না যে কবিতার শরীরে ধৃত এই যে শব্দগুলো এরা আর প্রতিদিনের শব্দ নয় মোটেই। কথাটা কি ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে? শামসুর রাহমান যে শব্দগুলো তাঁর এ কবিতার কাজে লাগিয়েছেন সেগুলো কি আমরা কবি না হয়েও নিত্য দিনের প্রয়োজনে তলব করি না? অবশ্যই করি, এবং এখানেই রোপিত হয়ে আছে ভাষা সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার বীজ।

সাহিত্য রচিত হয় ভাষা দিয়ে, ছবি আঁকা হয় রং দিয়ে, সঙ্গীত ধ্বনির সাহায্যে। যেসব ধ্বনির সমন্বয়ে সঙ্গীত সেই ধ্বনিগুলো আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে না; বাঁশি বেহালা সেতার তবলা সরোদ ঢাক—এসব যন্ত্র থেকে যে ধ্বনি নির্গত হয় তা দিয়ে আপিসের কাজ নিষ্পন্ন করা যায় না, সংসার নির্বাহ করা যায় না, কুশল বিনিময় করা চলে না। এই ধ্বনিগুলো একমাত্র সঙ্গীত রচনার জন্যেই ধরা রয়েছে। তাই, যদিও আমরা ধ্বনিসৃষ্টিকারী নানা রকম কলিং বেল ব্যবহার করি, স্কুল কলেজে ঘন্টা ব্যবহার করি, গাড়ির ভেঁপু বাজাই, আমরা জানি এগুলো প্রতিদিনের প্রয়োজনেই ব্যবহার করছি, সঙ্গীত রচনার কাজে লাগাচ্ছি না। বা, যেহেতু আমরা কলিং বেল টিপতে পারি, সাইকেলের বেল বাজাতে পারি—তাই আমরা একটু চেষ্টা করলেই বা ইচ্ছে হলেই সঙ্গীত রচনা করতে পারি এ রকম কথা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করি না।

ছবি আঁকার রংয়ের ব্যাপারে অবস্থাটা ত্রিশংকুর মতো। সঙ্গীতের মতো ছবির রং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়, আবার সাহিত্যের উপাদান যে ভাষা তার মতো নিত্যব্যবহার্যও নয়। রং আমরা ঘরের দেয়ালে লাগাই, দরোজা-জানালায় লাগাই—আবার সেই রং দিয়ে ছবিও আঁকা সম্ভব। শিল্পী যে রং ব্যবহার করেন তার রাসায়নিক উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী হয়ত ভিন্ন— হয়ত কেন? নিশ্চয়ই ভিন্ন— তবু শিল্পীর প্যালেটের রং আর মিস্তিরির বালতির রং চারিত্রের দিক থেকে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলে রংয়ের মিস্তিরি কখনোই মনে করবেন না যে তিনি ইচ্ছে করলেই ছবি আঁকতে পারেন বা আপনি নিজে যদি কখনো আপনার জানালা-দরোজা রং করে থাকেন তো আমি হলপ করে বলতে পারি আপনারও কখনো মনে হবে না আপনি এক টুকরো ক্যানভাস পেলেই কাইয়ুম চৌধুরীর মতো একটা ছবি এঁকে ফেলতে পারেন। একজন ডিএইচ লরেন্স যদিও বাড়ির গেট রং করবার জন্যে আনা রং দিয়েই তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটি এঁকেছিলেন, আমরা সে ঘটনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করি, সাধারণের বাইরে একটি ঘটনা বলে ধরে নিই—অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এটাই স্বীকার করে নিই যে দরোজায় রং লাগাতে পারলেই কিছু চিত্রকর হওয়া যায় না।

কিন্তু সাহিত্যের বাহ্যিক উপাদান, সঙ্গীতের ধ্বনির মতো, চিত্রকরের রংয়ের মতো যে ভাষা, সেই ভাষা, কিংবা এবার আরো নির্দিষ্ট করে বলি শব্দভাণ্ডার, সংসারী এবং সাহিত্যিক দুজনের জন্যেই সমানভাবে উন্মুক্ত এবং ব্যবহারযোগ্য। 'বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তী, ভদ্রপাড়া আর ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়ালাম'—এই বাক্যটি একজন শামসুর রাহমান কবিতায় উচ্চারণ করলেও বিচ্ছিন্নভাবে এই একই বাক্য, অবিকল একই চেহারায়, একজন সংসারীর মুখেও উচ্চারিত হতে পারে। আর এ কারণেই, বাইরে থেকে দু'ক্ষেত্রেই বাক্যের ও শব্দ ব্যবহারের চেহারা অভিন্ন বলেই, লেখক ছাড়া আর সকলের কাছেই মনে হয় ভাষা তো হাতের কাছেই আছে,

কেবল বড় রকমের বা চাঞ্চল্যকর একটি ভাব মাথায় আসবার অপেক্ষামাত্র; অথবা এমন মনে হয়, ভাব আছে, ভাষাও আছে, সময় করে টেবিলে কাজে গুছিয়ে বসা হচ্ছে না—এই যা।

যাঁরা বলেন, 'ভাব আছে, ভাষা নেই'—তাঁদেরও মনের কথাটি হচ্ছে, ভাষা নেই মানে অভিধানের বহু শব্দ তাঁদের জানা নেই, ব্যাকরণ সম্পর্কে অতটা জ্ঞান নেই, ব্যাকরণটা একটু রপ্ত করতে পারলেই এবং কিছু শব্দ আর অর্থ জেনে নিতে পারলেই মাথার ভাবটিকে তাঁরা দিব্যি লিপিবদ্ধ করে ফেলতে পারতেন। আসলে কিন্তু তা নয়। ব্যাকরণ জানা থাকলে আর শব্দের ভাণ্ডার বৃহত্তর হলেই সাহিত্য লেখা যায় না। অনেকেই হয়ত জানেন না, তাঁদের যে ব্যাকরণ পরিচয় আছে এবং যত সংখ্যক শব্দ জানা আছে তা দিয়েই সাহিত্য রচনা সম্ভব, যদি—এবং এই যদি টুকুতেই যা কিছু তফাত—যদি তাঁরা শব্দগুলোকে প্রতিদিনের অর্থ-থেকে বিযুক্ত করে দেখতে পারতেন। প্রতিদিনের অর্থ থেকে শব্দকে বিযুক্ত করে দেখার ব্যাপারটা হচ্ছে শব্দকে চিত্রকরের রঙের মতো, সঙ্গীত-রচয়িতার হাতে ধ্বনির মতো বিশুদ্ধ একটি উপাদানে পরিণত করে তোলা। এবং একবার এই বিযুক্তিকরণ সম্ভব হলেই আমরা দেখব শব্দের অর্থ প্রতিভা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি দুটি শব্দ একে অপরের দেহে প্রতিফলিত হয়ে যুগলে নতুন একটি অর্থের জন্ম দিচ্ছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক রহিত দুটি বস্তুর ভেতরে এমন এক বন্ধন রচিত হচ্ছে যা শিল্প।

আমার একটি সিদ্ধান্ত আছে, আর তা হলো, শিল্প মূলতঃ এমন দুটি বস্তু, এমন দুটি অনুভব, এমন দুটি অভিজ্ঞতার ভেতরে সম্পর্ক স্থাপন যা ইতোপূর্বে অজ্ঞাত ছিল, অচিন্তিত ছিল। যেমন ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই, অতি ব্যবহৃত এই উপমাটি—'চাঁদের মতো মুখ'। ভেবে দেখুন, পৃথিবীতে যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন চাঁদের সঙ্গে মুখের, সম্পূর্ণ ভিন্ন মণ্ডলের, ভিন্ন উপাদানের, ভিন্ন অস্তিত্বের এই দুটি বস্তুর ভেতরে একটি সম্পর্কসূত্র আছে, তিনি কী দুঃসাহসিক একটি কল্পনা করতে পেরেছিলেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন কবি, যদিও আজ বারবার ব্যবহারে মলিন এই উপমাটি অতি নির্বোধ কোনো রমণীকে, শোনাতে আমরা ভীষণ ইতস্তত করব। প্রথম সেই ব্যক্তিটির পক্ষে এই উপমা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি 'চাঁদ' এবং 'মুখ' এই দুটি শব্দকে প্রতিদিনের ব্যবহার ও প্রতিদিনের শব্দার্থ থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন।

লেখকের প্রথম শর্তই এই যে, তিনি গদ্যই লিখুন আর কবিতাই লিখুন, শব্দকে দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে মুক্তি দিয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রহণ করবেন এবং তারপর তাঁর অভিপ্রায় এবং অভিব্যক্তি সেই শব্দের ভেতরে চারিয়ে দেবেন। এই চারিয়ে দেয়াটা ষোলোআনাই ভাব নির্ভর, এবং এই 'ভাব' সম্পর্কেও আমাদের আছে মারাত্মক এক ভুল ধারণা।

৬. ভাব আছে ভাষা নেই

'ভাব আছে ভাষা নেই'—এ হতে পারে না। ভাব থাকলে তার ভাষাও আছে। ভাষা যদি লেখককে পরাজিত করে তাহলে অন্তত আমি বুঝে নেব যে লেখকটির ভাবেই আছে গলদ। ব্র্যাকেটে আবার এও বলে রাখি যে ভাব আছে ভাষা আছে, তার মানে এ নয় যে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই তরতর করে লিখে ফেলা যাবে। ভাব থাকা সত্ত্বেও লেখার পরিশ্রম আমাদের স্বীকার করতে হয়, হয়ত বারবার কাটাকুটি করতে হয়, বাক্য কি কোনো অনুচ্ছেদ পুরো নতুন করে লিখতে হয়, এমন কি লেখার পরও বর্জন-সংযোজন করতে হয়। আগে কোথাও বলেছি, সৃষ্টির আছে একটা অন্ধকার দিক, আর সে কারণেই লেখককে সতর্ক থাকতে হয় যে, তাঁর হাত দিয়ে যা বেরুলো সেটা সর্বাংশে শেষ পর্যন্ত সচেতন বিচারে লেখা হচ্ছে কি না।

লেখার পেছনে 'ভাব' থাকতেই হবে; গোলমাল এই 'ভাব' কথাটি নিয়েই।

'ভাব' বলতে আমরা কি বুঝি? আমার এক গুরুস্থানীয় আত্মীয় আছেন, তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর গ্রামে আনতে বলতেন; বলতেন, তাঁর ওখানে গেলে, বিশেষ করে খালপাড়ে জাম গাছের তলায় বিকেল বেলায় বসলে লেখার জন্যে প্রচুর 'ভাব' আমি পেয়ে যাবো। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি মফস্বলে চিকিৎসক; তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আমি কাটালে লেখার অনেক উপকরণ পেয়ে যাবো অর্থাৎ 'ভাব' সংগ্রহ করতে পারব। আবার এমন কিছু পরিচিত পুরুষ ও রমণী আছেন যাঁরা দেখা হলেই আমাকে তাঁদের 'ভাব'টি ধার দেবার জন্যে অধীর হয়ে পড়েন।

এই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, প্রথম যৌবনে আমরা যে ক'জন গল্প লিখছিলাম আমাদের কারো কারো প্রধান একটি খেদ ছিল যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নেই—জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা; তাই কোনো কোনো বন্ধু বলতেন এবার গ্রামে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে হবে, কিংবা মেঘনায় জেলেদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করতে হবে—নইলে আর লেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু সেদিন যেটা বুঝতাম না—নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্যই দরকার তবে যেহেতু আমি বেঁচে আছি, বিশেষ একটা পরিবেশে বাস করছি, নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তাই আমার যে আদৌ কোনো অভিজ্ঞতা নেই বা লেখায় ব্যবহারযোগ্য অভিজ্ঞতা নেই, এ কথা সত্য নয়। যে যেখানে আছি, আমরা যে যে-পরিস্থিতিতেই আছি প্রতি মূহূর্তে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি; আর এই অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে একটা উদ্যোগ দরকার। আর এই উদ্যোগটি ঠিক কি তা আমাদের জানা নেই বলেই ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে হয় না। শূন্যতা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, শহরবাসী হয়ে গ্রামজীবন সম্পর্কে জানলাম না লিখলাম না বলে ব্যর্থ মনে করি নিজেকে, কিংবা আরো মারাত্মক এমন সব লেখা লিখি, যার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই—বস্তুত শোনা কথা বা যেমনটি হলে 'আহ, এই লেখকের বেশ জানা আছে তো জেলেদের বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের জীবন' এই কথাটি লোকে বলবে তেমনটি লেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্তু এই কথাটি যিনি বলছেন, তিনি কতটা পরিনত মনের মানুষ, কতটা সচেতন তা আমরা বিচার না করেই এগোই এবং এদেরই কাছে প্রশংসা পেয়ে ধন্য বোধ করি।

আসলে কথা হচ্ছে, আমার তো তাই মনে হয়—আমরা কি লেখক কি লেখক-যশোপ্রার্থী কি পাঠক, আমরা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'ভাব'কে অভিন্ন করে দেখে থাকি, আর গোলমালটা এখানেই। একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা অবিরাম অর্জন করে চলেছে, তা সে অভিজ্ঞতা রাস্তায় হোঁচট খাবার

মতো তুচ্ছ এবং বিনাশী অভিজ্ঞতাই হোক, কিংবা পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হতে দেখে নিজের ভেতরে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের প্রেরণাবোধ করবার মতো ত্রিকালছোঁয়া অভিজ্ঞতাই হোক। অনুভূতি ছাড়া মানুষও নয়; প্রতি মুহূর্তেই আমরা কোনো না কোনো অনুভূতির জন্ম হতে দেখছি আমাদেরই মন ও চেতনার ভেতরে। কিন্তু অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকাই ঐ মানুষটির লেখক হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রেমে একজন প্রতারিত হয়েছেন, তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, কাউকে এখন তিনি আর বিশ্বাস করেন না—এরকম অভিজ্ঞতা তো কতজনের, আর এই বিশেষ অভিজ্ঞতার পরে কতজনই তো কত লেখককে, যদি কোনো লেখক পরিচিত থাকে, অনুরোধ করেছেন আমার কাহিনী লিখুন—আমি লিখতে পারছি না, ভাষা থাকলে আমিই লিখে ফেলতে পারতাম। কিন্তু না, এ ভাবে লেখা যায় না, যেমন কেবল অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা থাকলেই লেখা যায় না। কেন যায় না? সেই কথাটিতেই এখন আসছি।

লেখার জন্যে প্রয়োজন যে 'ভাব' সেটা অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা নয়। অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে যখন আমরা সমাজ, পরিবেশ এবং সময়ের পটভূমিতে স্থাপন করে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারি তখনই তা 'ভাব'; এই স্থাপন করাটা, এই সম্পর্ক আবিষ্কার করাটাই, লেখকের একেবারে গোড়ার কাজ। আর এ যিনি করতে পারেন তিনি এটাও জানেন যে, লেখার জন্যে তাঁর অভিজ্ঞতা শুধু আছে তাইই নয়, এত বেশি আছে যে কোনটাকে রেখে কোনটা নিয়ে কাজ করবেন সেটা নির্নয় করাই তাঁর পক্ষে বিরাট এক সমস্যা।

যিনি বলেন, আমার এ অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি লিখুন, তিনি ভাষা নেই বলে যে অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগাতে পারছেন না তা নয়; তিনি ঐ সম্পর্ক আবিষ্কার ও পটভূমিতে স্থাপন করতে অপারগ বলেই হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

অনেক ক্ষেত্রে খোদ লেখকেরাও এটা উপলব্ধি করতে পারেন না; আর তাই দেখা যায়, জামগাছ তলায় বসে বিকেলের সূর্যাস্ত ফসলের মাঠে দেখে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এমনকি জীবন বিমুখ রচনা কলম থেকে বেরিয়ে আসছে। আবার এর উলটো যাত্রাও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমরা দেখি, পরিবেশ সমাজ ও সময়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেলাতে গিয়ে এতটাই কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়েছি যে রচনার বিশ্বাস—যোগ্যতাই হারিয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাকে সময়ের পটভূমিতে স্থাপন করতে পারাটাই লেখকের আসল প্রতিভা। অন্য কথায় 'ভাব' কেবল তাঁদেরই আসে যাঁদের আছে লেখার প্রতিভা। আর সবার জন্যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাই, অনুভূতি নিছক অনুভূতি।

৭. ভাব ও ভাষার সম্পর্ক

আমি দেখছি, অনেকের কাছেই প্রধান এবং গোপন একটি দুর্ঘটনা হচ্ছে, তাদের ভাব আছে ভাষা নেই। আমার লেখক জীবনে কম করে হলেও কোটিখানেক, সংখ্যায় তাঁরা এতই যে কোটিখানেক বলেই মনে হয়, এঁরা আমাকে বলেছেন—যদি ভাষার ওপর তাঁদের দখলটা থাকত! তা হলে? তাহলে কি হতো? তাঁরা লিখতেন, বঙ্গদেশকে দুলিয়ে দিতেন

এবং খ্যাতির রোদ্দুরে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতেন। এঁদের অনেকে আবার এত দূর পর্যন্ত মনে করেন যে, তাঁরা লিখছেন না বলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা বাজার গরম করে রেখেছেন, যদি তাঁরা লিখতেন, যদি তাঁদের ভাষাটা থাকত তাহলে বর্তমান লেখকেরা রণে ভংগ দিতেন।

আবার কিছু তরুণ লেখককে আমি খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করতে দেখেছি যে—ভাষাটা এখনো তাদের দখলে নেই। আর প্রায়ই এমন পুস্তক সমালোচনা আমার চোখে পড়ে যেখানে দুঃখ প্রকাশ করা হয়—আলোচিত লেখকটি ভাষার দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে পারতেন।

আমার মনে হয়, এসব কথার গোড়াতেই একটা ফাঁক আছে। ধরেই নেয়া হয়েছে যে ভাব এবং ভাষা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রয়োজন ও প্রেরণার ক্ষেত্রে ভাব, ভাষা ছাড়াই এসে পড়তে পারে; কিংবা ভাষাটা আয়ত্ত্বে আছে কিন্তু ভাব, যুৎসই একটা ভাব, আপাতত হাতে নেই।

কিন্তু তাই কি?

সাহিত্য থাক, দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকানো যাক। আমাদের ভেতরে ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ আছে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কিছু চাইবার আছে, কিছু দেবার আছে, শূন্যতা আছে, তৃপ্তি আছে, আর এগুলো আমরা অনবরত প্রকাশ করে চলেছি, প্রধানত ভাষার সাহায্যেই। ভঙ্গী বা অভিব্যক্তি দিয়েও প্রকাশ করি; এর মিশোল তো প্রায় সার্বক্ষণিক, তবে প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ঐ ভাষা। কই, কখনো তো আমাদের মনে হয় না যে ভাষাটা ঠিক আয়ত্ত্বে নেই বলে মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারলাম না! ক্ষুধার সময় আহার্য চাইতে পারলাম না ভাষার অভাবে, অথবা ট্রেন লেট দেখে পাশের লোকটিকে আমার বিরক্তি জানাতে পারলাম না—এমন দুর্ঘটি আমার অন্তত জানা নেই। হয়ত কেউ বলবেন, এমন অনেকে সত্যি সত্যি আছেন যাঁরা কিছু বলতে পারেন না, এমনকি মুখ ফুটে খাবারও চাইতে পারেন না। আমি বলব, এবং আপনারাও একটু ভেবে দেখবেন, তাঁদের মুখ যে ফোটে না সেটা ভাষার অভাবের দরুন নয় বরং অনিচ্ছা থেকে; মুখচোরা যিনি, লাজুক যিনি কিংবা স্বভাবতই অপ্রতিভ যিনি, তিনি যে চুপ করে থাকেন তার জন্যে দায়ী ভাষা নয়, তাঁর চরিত্র।

আবার কখনো আমরা প্রয়োজনেই চুপ করে থাকি। যেমন ধরুন, কারো বাবা মারা গেছেন। মৃতদেহের সম্মুখে তাঁকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। আত্মীয়স্বজন বিলাপ করে চলেছেন কিন্তু তিনি নির্বাক। তাঁর দুঃখ হচ্ছে, শোক হচ্ছে কিন্তু ভাষা নেই বলে তিনি তা প্রকাশ করছেন না, তা নয়। এমনকি তিনি যদি বলেনও যে শোকে তিনি পাথর হয়ে গেছেন, বাক্যহারা হয়ে পড়েছেন, তবু বলব তাঁর উক্তিটি সত্য নয়। কারণ, এই লোকটিই, ধরুন, তাঁর বিদেশ বাসরত ছোট ভাইকে বাবার মৃত্যু সংবাদ সে রাতেই লিখতে বসলেন, তিনি তাঁর বিয়োগ ব্যথা ঠিকই প্রকাশ করতে পারবেন, এবং তা প্রতিদিনের ভাষাতেই। তাঁর শূন্যতা প্রকাশের জন্যে তিনি যে চিঠির পাতা শাদা রেখে দেবেন, এটা কোনো উন্মাদেও মনে করবে না।

আমরা অনেক সময় বলি, প্রেমের ক্ষেত্রেই আসুন, যে 'তোমাকে কতখানি ভালোবাসি তাহা ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারি না'।—এখানে আপনি যদি ধরে নেন যে বক্তা সত্যি সত্যি

ভাষার কাছে পরাভব স্বীকার করেছে, তাহলে ভুল হবে। আসল ঘটনা এই যে, ভাষা ও ভাবই ব্যক্তিটিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে; ঐ যে ভাষায় বোঝানোর অপারগতা, ওটা আসলে ভাষাতেই বোঝাবার বিশুদ্ধ এক রীতি। কিংবা অতিব্যবহৃত একটি পথ।
এখানে জনান্তিকে বলে রাখি যে আমরা আমাদের নিবিড়তম, শুদ্ধতম, গভীরতম অনুভূতি বা চিন্তাগুলোকে যতই অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব বলে মনে করি না কেন, সাধারণ জীবনে তার প্রকাশ কি উচ্চারণ কি চিঠিতে যে অতিপ্রচলিত, অতিব্যবহৃত অতিমলিন শব্দগুচ্ছ ছাড়া করতে পারি না—যতই আমরা মনে করি না কেন যে এই নারীকে আমি যেমন ভালো বেসেছি আর কেউ কখনো তেমন ভালোবাসার সাক্ষাৎ পায়নি, তবু যে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'র চেয়ে ভিন্ন বা নতুন কিছু উচ্চারণ করতে পারি না, এখানেই লুকিয়ে আছে সাহিত্য হয়ে ওঠার প্রধান চাবিকাঠি। প্রতিদিনের প্রয়োজনের মুহূর্তে ভাষা আমাদের এড়িয়ে যায়নি কখনো। আর একথা বলবার কোনো অপেক্ষাই রাখে না যে, প্রয়োজন থেকেই ভাষার জন্ম। মানুষ যেমন সেই সুদূর অতীতে নিজের প্রয়োজনেই নির্মাণ করে নিয়েছে ভাষা, তেমনি আজো মানুষ তার প্রয়োজনের ব্যাপ্তি, গভীরতা বা তীব্রতার মাপেই ভাষাকে অবিরাম ব্যবহার করে চলেছে। এমন কি নীরবতাকেও আমরা কখনো কখনো ভাষার মতোই, কিংবা ভাষার চেয়েও অধিক মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলি এই প্রয়োজনের প্রয়োজনেই। আর প্রতিদিনের জীবনে, সাধারণ আমরা, আমরা যাঁরা লেখক নই, যখনই এই নীরবতাকেই ব্যবহার করি, যখন কারো প্রশ্নের পিঠে নিরুত্তর থাকি উত্তর থাকা সত্ত্বেও, তখন নিজের অজ্ঞাতেই আমরা প্রমাণ দিই যে ভাব ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের রক্তের ভেতরেই আছে।
সম্পর্কটা এই যে, খুব সোজা করে বলতে গেলে, অনুভূতি যত গভীরই হোক না কেন, ভাব আমাদের ভেতরে যতখানি স্পষ্ট, ভাষাও সেই একই পরিমাণে আমাদের আয়ত্ত্বাধীন। সেই সঙ্গে আরো একটি কথা যোগ করতে হয়, যে ভাবটি আমাদের ভেতরে রয়েছে তা কতখানি আমি বিশ্বাস করছি, তারই সমমাত্রায় আমার সমস্ত মূলবোধ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাষার ওপর আমি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করি, তারই সমমাত্রায় আমরা সাহস অর্জন করি শব্দ-সন্ধানের অভিযানে বেরিয়ে পড়বার—এবং কেবল শব্দ নয়, উপমা চিত্রকল্প গদ্যভঙ্গী আবিষ্কারের অভিযানও তা বটে।

৮. সাহিত্যের গদ্য কানে শোনার জন্যই লেখা

অভিধান অনুসারে গদ্যের একটি সংজ্ঞা—যা ছন্দে লেখা নয়। অবশ্যই এখানে কবিতার ছন্দ বোঝানো হয়েছে। এই যে এখন আমি লিখে চলেছি, এটা কবিতার কোনো ছন্দে লেখা নয়, এমনকি লাইন ভেঙ্গে ছাপলেও কেউ এই বাক্যগুলোকে কবিতা বলে ভুল করবেন না। কবিতা না হয় না হলো, অনেক ছন্দোবদ্ধ লেখাই তো কবিতা নয়, যেমন—'ইহাতে নাহিক কোনো মাদকতা দোষ, কিন্তু পানে চিত্ত করে পরিতোষ।' আবার, ছন্দে লেখা নয়, অথচ কবিতা—এও তো হয়। যেমন—'বাতাসে ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকার'—কবিতার লাইন, গদ্যে লেখা হলেও। না, সে অর্থেও আমার এ লেখা কবিতা নয়। আমি লিখছি বিশুদ্ধ গদ্য। কিন্তু মজাটা এখানেই যে, অভিধানে যা লেখেনি, গদ্যেরও আছে ছন্দ। সেই ছন্দটা নির্দিষ্ট নয়, এ ছন্দ একেক লেখকের হাতে একেক রকম, বস্তুত পক্ষে প্রতিটি গদ্যলেখক নির্মাণ করে নেন তাঁর নিজস্ব ছন্দ; তাঁরই, কেবল তাঁরই পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি ছন্দ; এবং সচেতন ও প্রতিভাবান গদ্য লেখক উদ্ভাবন করে নেন একাধিক ছন্দ। একাধিক হলেও সেখানে একটি মাতৃ-কাঠামো লক্ষ্য করা যায়, একটি প্রধান শরীর পাওয়া যায় যার অস্থি থেকে নির্মিত হয়েছে অপরাপর ছন্দ।
গদ্যের এই ছন্দটি কবিতার ছন্দের মতো বারোয়ারী, অর্থাৎ যে কোনো লেখকের হাতে ব্যবহৃত হবার জন্যে সঙ্গীতের গণিত অর্থে গাণিতিক হিসেবে শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় প্রাপ্য নয় বলেই আমরা গদ্যের ছন্দ ঠিক লক্ষ করে উঠতে পারি না। আর এই অপারগতা থেকেই আমরা উচ্চারণ করে থাকি এইসব প্রশংসা যে 'তাঁর গদ্য চমৎকার' 'তিনি ঝরঝরে গদ্য লেখেন' বা 'তাঁর গদ্যের হাত বড় মিষ্টি।'
গদ্যের ছন্দ আছে, বলা উচিত গদ্যেরও ছন্দ আছে, কিন্তু 'ছন্দ' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থে কবিতার ছন্দ থেকে আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নিতে হবে। নতুন শব্দ নির্মাণ করবার প্রতিভা বা পাণ্ডিত্য কোনোটাই আমার নেই, অগত্যা বিস্তৃত করেই বলি যে, গদ্যের এই ছন্দ আসলে একই সঙ্গে গতি এবং ভঙ্গী।
আমার একটি স্থির সিদ্ধান্তের কথা এখানে বলে নিলে ভালো হয়। সাহিত্য ষোলো আনা কানে শোনার জিনিস। অক্ষর সাজিয়ে কাগজের ওপর আমরা সাহিত্য লিখি, সাহিত্য আমরা পৌঁছে দিই লিখিত বা মুদ্রিত অবস্থায়, আর কিছু ব্যতিক্রম স্বীকার করে মনে মনেই আমরা সাহিত্য পড়ে থাকি। তা সত্ত্বেও আমি বলব, রচনার মুহূর্ত থেকে উপভোগের মুহূর্ত পর্যন্ত সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে কান নির্ভর, তা আমরা যতই মনে মনে পড়ি আর অখণ্ড নীরবতার ভেতরে রচনা করি না কেন। কবিতার বেলায় এ কথা মেনে নিতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু ধরুন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি—এ উপন্যাস কি কানে শোনার জন্যে, উচ্চারণ করে পড়বার জন্যে লেখা? আমার উত্তর হ্যাঁ, অবশ্যই। তাই যদি না হয়, তাহলে, কি করে আমরা লক্ষ করি বাক্য থেকে বাক্য গড়িয়ে যাবার দোলা? আর কেনই বা লেখক দীর্ঘ বাক্য লেখার পর ছোট ছোট বাক্য লেখেন এবং আবার ফিরে যান দীর্ঘ একটি বাক্যে? কেন তিনি ক্রিয়াপদকে স্থাপন করেন কখনো এখানে, কখনো ওখানে? একই সঙ্গে কান এবং মনকে নাড়া দিয়েই সাহিত্যের ধর্মরক্ষা হয়—এই কথাটি স্বীকার করে নিলে আমরা গদ্যেরও যে ছন্দ আছে তা অনায়াসে লক্ষ করতে পারব।
কানকে উপেক্ষা করে গদ্য লেখা সম্ভব নয়, মনে মনে পাঠক পড়বেন এই সত্যটি জেনেও গদ্যলেখক উচ্চারণের জন্যেই তাঁর রচনাকে প্রস্তুত করে তোলেন। যিনি এই উচ্চারণের দিক অস্বীকার করেন কিংবা অনুভব করেন না, তাঁর কাছ থেকে আর যাই হোক 'গদ্য' আমরা আশা করতে পারি না। আর সেই গদ্য, এর ভেতরকার গতি ও ভঙ্গী, যদি বক্তব্যের সঙ্গে হাত ধরে চলে তো আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এক 'অনিন্দজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু' প্রত্যক্ষ করবার আনন্দ পাই।
গদ্য যখন কানে শোনবার জন্যে নয়, তখন আর সেটা সাহিত্যের আওতায় থাকে না। তখন সে আইনের গদ্য। আসলে, আইনের চত্বরেই গদ্য একমাত্র 'লিখিত' হয়। আইনের

গদ্যই মনে মনে পড়বার মতো গদ্যের একমাত্র উদাহরণ। যেমন দেখুন, বলা উচিত, পড়ুন—১৯৭১ সালের দশই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত এই ঘোষণাটি—
'যেহেতু বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের সাতই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের সতেরোই জানুয়ারী পর্যন্ত মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংবিধান রচনার জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের ভেতরে ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে নির্বাচন করেছিল এবং যেহেতু সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ১৯৭১ সালের তেসরা মার্চ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ডেকেছিলেন এবং যেহেতু আহুত ঐ অধিবেশন একতরফা ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি করে দেয়া হয়েছিল এবং যেহেতু তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করবার বদলে এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা অব্যহত থাকাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায় এবং বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধ ঘোষণা এবং গণহত্যা শুরু করেন ...' এইভাবে একের পর এক 'এবং যেহেতু' দিয়ে শুরু বাক্যাংশগুলো আরো এক ডজন বার না পেরুনো পর্যন্ত আমরা জানতেই পারি না এইসব 'এবং যেহেতু'র শেষে আছে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা।
যদি সাহিত্যিক কারণে, অন্তত পক্ষে সাংবাদিক প্রয়োজনে, এই ঘোষণাটি রচিত হতো তাহলে প্রথমেই আমরা শুনতাম বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। তারপর বর্ণিত হতো ঐ ঘোষণার পেছনে কারণগুলো। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ উল্টো মেরু থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত হতো।
কিন্তু আইনের গদ্য সৃষ্টিশীল গদ্য নয়, তার লক্ষ্য কান ও মনকে নাড়া দেয়া নয়, তার উদ্দেশ্য পাঠক-শ্রোতাকেও সৃষ্টিশীল করে তোলা নয়।
ঐ যে বললাম, ওপরের ঘোষণাটি ভিন্ন প্রয়োজনে শেষ থেকে শুরু করতে হতো—এটাও কিন্তু শেষ কথা নয়। হয়ত বর্তমান ঘোষণার জন্যে ঠিক শেষ প্রসঙ্গ থেকেই শুরু করতে হতো, কিন্তু একটি বক্তব্য ঠিক কোন অংশ থেকে লেখক শুরু করবেন সেটা যেমন সৃষ্টির রহস্যময় আঁধার এলাকার ব্যাপার, তেমনি লেখকের নিজস্ব গদ্য ছন্দেরও। বিশেষ করে ঐ লেখকের গদ্য ভঙ্গীর। একেক লেখায় একেক এই ভঙ্গীটুকুর জন্যেই একজন গদ্য লেখক নিজের জন্যে একাধিক ছন্দ উদ্ভাবন করে নিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তিনিই থেকে যান।

৯. গদ্যের ভেতরে গতি ও ভঙ্গী

গদ্যের শরীরে রয়েছে দু'টি ঘটনা— গতি এবং ভঙ্গী; আবার ভালো করে দৃষ্টি দিলে দেখব, ঐ গতিটিও ভঙ্গীরই অন্তর্গত। গদ্যের গতি এবং চাল বিষয় বুঝে পালটায়, কিন্তু ভঙ্গীটি অক্ষুন্ন থেকে যায়; বলতে লোভ হয়, এবং বলেই ফেলি— লেখকের গদ্য তার ভঙ্গী, ভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়।
রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে; বস্তুত পক্ষে বাংলাভাষায় তাঁর মতো বিরামহীন দীর্ঘকাল গদ্য লিখেছেন আর কেউ, আমার জানা নেই। যৌবনের শুরুতে

বিলেত থেকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছ থেকে শুরু করে শেষ বয়সে লেখা ছেলেবেলার স্মৃতি বর্ণনা পর্যন্ত কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেছেন— চিঠি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, লিখিত ভাষণ, মৌখিক উচ্চারণ, এমন কি নাটক— হ্যাঁ, তাঁর নাটকে পর্যন্ত আমরা লক্ষ করি বিশিষ্ট এক ভঙ্গী, হয়ত সে ভঙ্গী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো স্বাস্থ্য, আরো কান্তি পেয়েছে, কিন্তু চেনার বাইরে কখনই বদলে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব ভঙ্গীটির জন্যেই, তিনি সাধু কিংবা চলতি যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনে নিতে পারি স্বাক্ষরহীন অবস্থাতেও; এমনকি তাঁর প্যারডি রচনা করাও আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় ঐ ভঙ্গীর ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র। 'সে চলে গেল। তার চলে যাবার সুরটি চিরকালের বাঁশী হয়ে রয়ে গেল কোথাও।'— এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়,কিন্তু রাবীন্দ্রিক— শুদ্ধ এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীটি এখানে ধার করা হয়েছে।
গদ্যের এই ভঙ্গী, আমার ধারণায়, কতগুলো উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে। অংকের মতো যোগ মিলিয়ে দিতে পারব না; সৃষ্টিশীল যে কোনো কাজের বেলায় সেটা অসম্ভব প্রস্তাব; সৃষ্টির প্রক্রিয়া— তার সবটাই আলোকিত নয়; তবু চেষ্টা করতে পারি। আমার মনে হয়, গদ্যের ভঙ্গী— এর মূল শেকড়টি ঐ লেখকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত রুচি এবং যে শ্রেণীর জন্যে লেখা সেই শ্রেণীর সবচেয়ে উন্নত সদস্যদের গড় বাগ্‌ভঙ্গীর ভেতরে প্রোথিত। এই তিন ক্ষেত্র থেকে রস নিয়েই গদ্যভঙ্গীর বিস্তার—সংস্কৃতি, রুচি এবং উদ্দিষ্ট শ্রেণী; এর পরেই আসে বাক্যগঠন পদ্ধতি, উপমা-তুলনা-চিত্রকল্প সংগ্রহ করবার নিজস্ব ভাঁড়ার এবং আপন ব্যক্তিত্ব-প্রতিফলিত শব্দের ব্যবহার। এগুলো তো বটেই, এর অতিরিক্ত আরো কিছু উপাদান নিশ্চয়ই আছে যার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ সম্ভব হলেই আমরা বিশিষ্ট এক গদ্যভঙ্গী পাই।
লক্ষ করা যাবে, একটু আগে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে 'এমন কি নাটক' কথাটা বলেছি; ঐ 'এমন কি' ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। আমার ধারণা, গদ্য রচনার একমাত্র উদাহরণ নাটকেই কেবল লেখকের গদ্যভঙ্গী সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা যে কখনই কোনো নাটকের গদ্য নিয়ে, তথা নাট্যকারের গদ্য নিয়ে কথা বলি না, তার কারণ, নাটকে গদ্য আসে সংলাপ হিসেবে এবং সে সংলাপ কোনো না কোনো চরিত্রের সংলাপ। নাট্যকার যখন সংলাপ লেখেন তখন তিনি তাঁর নিজস্ব কাঠামোর ভেতরে থেকে নয়, সেই বিশেষ চরিত্রটির সামাজিক ও ব্যক্তিগত কাঠামোর ভেতরে থেকেই লেখেন। কথাটা ভালো বোঝা যাবে উৎপল দত্তের প্রবন্ধের গদ্যের পাশাপাশি তাঁর নাটকের 'গদ্য' রেখে দেখলে।
রবীন্দ্রনাথের গদ্য নাটকগুলো সংলাপেই যে রচয়িতার পরিচয় প্রকাশ করে দেয় তার প্রধান কারণ, চরিত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের মতোই কথা বলে, তারা একই ক্ষেত্র থেকে উপমা তুলনা চিত্ররূপ আহরণ করে, একই বাক্যগঠন রীতি অবলম্বন করে, বাক্যে ক্রিয়াপদও তারা একই ভাবে ও অবস্থানে বসিয়ে থাকে।
গদ্যভঙ্গীর আরো একটি উপাদান— ইংরেজি বাক্য গঠন রীতি। ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠন রীতির অনেকখানিই আবার জর্মন রীতি থেকে ধার করা; তাই একে আমি এখন ইয়োরোপীয় রীতি বলব।
এই রীতির প্রয়োগ বাংলা গদ্যে খুব বেশি দিন শুরু হয় নি; বলা যায় তিরিশের দশকে, প্রধানত তিরিশের কবিদের হাতেই এর সূত্রপাত। এ গদ্য যে কৃষকের মাথায় ফেল্‌ট্ হ্যাট,

তা নয়; অনুবাদ মনে হবে, তাও নয়; কারণ বাংলাভাষা জীবন্ত ভাষা, আর জীবন্ত বলেই তার ক্ষুধা আছে, নতুনতর ভারবহনের জন্যে অধিকতর বল সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে; সেই প্রয়োজনেই বাংলাভাষাকে ইয়োরোপীয় বাক্যগঠন রীতি আত্মসাৎ করতে হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু, আমার ধারণা, ইয়োরোপীয় এই রীতির সঙ্গে বাংলা বাগ্‌ভঙ্গীর সবচেয়ে সক্ষম ও সফল বিবাহটি করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর সবশেষ বই 'মহাভারতের কথা' থেকে যে কোনো একটি অংশ পড়ি— 'কত সুখ হতো আমাদের, যদি সঞ্জয়ের শেষ পরামর্শটি মেনে নিয়ে এবং নিজের ইচ্ছার নির্দেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতেন— যদি সেই শোণিতস্রাবী আঠারো দিন ধরে আমরা তাঁকে চোখে না দেখতাম— অথবা দেখতাম বলরামের মতো কোনো স্নিগ্ধ তীর্থে, কোনো নির্জন নদী তীরে বিশ্রান্ত। কিন্তু তিনি যে শুধু শারীরিকভাবে দূরে গেলেন না তা নয়, পারলেন না মনের দিক থেকেও সরে যেতে : আমরা দেখছি জুয়োর মতোই জয়ের নেশাতেও মেতে উঠেছেন তিনি, আর সে জন্যে অন্যায় কাজও একের পর এক করে যাচ্ছেন।'— বলে দিতে হবে না, এখানে বাক্যগঠন রীতি কোনো দিক থেকেই বাংলা ভাষায় প্রচলিত বা বাংলা ব্যাকরণ সম্মত নয়; অথচ এ শুধু বাংলাই নয়, জীবন্ত বাংলা; এ গদ্য এক প্রতিভাবান লেখকের সৃষ্টিশীল গদ্য, তাঁর আপন গদ্য। গদ্যের যে ভঙ্গীর কথা বলছিলাম, লক্ষ করা যাবে, বুদ্ধদেবের বেলায় বিশেষ এই বাক্যগঠনরীতিও তাঁর ভঙ্গী রচনায় বড় রকম সাহায্য করেছে।

গদ্যের ভঙ্গী নির্মাণের পেছনে আরো একটি জিনিশ কাজ করে। এ হল লেখক নিজেকে পাঠক থেকে কতটা দূরত্বে স্থাপন করছেন; আর, এই দূরত্ব সরল রৈখিক অথবা তির্যক সেটাও একই সঙ্গে লক্ষ করতে হয়।

১০. বিষয় থেকে লেখকের অবস্থানের দূরত্ব

লেখক তাঁর একেকটি রচনায় নিজেকে একেক দূরত্বে রাখেন, কথাটা গল্প বা উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁদের বেলায় পুরোপুরি সত্যি বলে আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের বেলায় তা বলতে পারছি না। লক্ষ করেছি, পাঠক থেকে প্রবন্ধলেখকের দূরত্ব বিষয়ভেদে, এমনকি কালভেদেও ভিন্ন হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধও লিখেছেন, গল্প বা উপন্যাসে নিজের অবস্থান যে তিনি অনবরত বদলে নিয়েছেন, তাঁর প্রবন্ধে সেই চঞ্চলতা আমি আবিষ্কার করতে পারি না।

ভাষা এবং ছন্দ বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধ থেকে তিন কালের তিনটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক।

১৩০২ সনে তিনি লিখছেন, 'একে বাংলা শব্দের কোনো ভার নাই, ইংরেজি প্রথামতো তাহাতে একসেন্ট নাই, সংস্কৃত প্রথামতো তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘনঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া

তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেই রূপে ঘনঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া।'

এর বাইশ বছর পর ১৩২৪ সনে রচিত অন্য একটি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি—'আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ডক্লাশের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নিচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ডক্লাশের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাশের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে।'

আরো একুশ বছর পরে, জীবনের শেষপাদে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৩৪৫ সনে—'মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হলো চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদান-প্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হলো মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।'

প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই তিন উদাহরণ, এদের দিকে তাকিয়ে কি আমাদের চোখে পড়ে না একটা অভিন্ন ধার-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি মুখ, যে মুখ একইভাবে এবং একই কোণ থেকে আমাদের দিকে ফেরানো আছে? কিন্তু এই কথাটি, এই অনুভবটি, অর্জন করা যাবে না রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাসগুলোর সাক্ষাত পাবার পর। রাজর্ষী, বৌঠাকুরানীর হাট, গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা—প্রতিটি রচনায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব নিয়ে আমাদের সমুখে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর গদ্যের বোল পালটাচ্ছে, চাল পালটাচ্ছে, গঠন বদলে যাচ্ছে প্রতিটি বার। গল্পগুচ্ছের অখণ্ড সংস্করণ হাতে নিয়ে ওপর থেকে একবার চোখ বুলিয়ে গেলেও আমাদের নজর এড়াবার নয় যে প্রতিটি গল্পে তিনি নতুন এবং ভিন্ন গদ্যলেখক।

আমার বিশ্বাস, লেখকের দূরত্ব এবং মুখ যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে, লেখকটির মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে; এবং সে পরিবর্তন যদি তাঁর আস্থা এবং অস্তিত্বের শেকড় পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় তাহলে কখনোই তাঁর আর আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়—ঠিক যেমন বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় মানবপূর্ব প্রাণীতে ফিরে যাওয়া। মৌলিক এ ধরনের পরিবর্তন উদাহরণ হিসেবে লক্ষ করতে পারি সৈয়দ আলী আহসানের বেলায়। তাঁর মধ্যপঞ্চাশ-দশকপূর্ব কালে রচিত প্রবন্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালের প্রবন্ধ বা গদ্য রচনাগুলো মিলিয়ে পড়লেই স্পষ্ট হয় যে, এই লেখকের চিন্তার জগত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে সম্পূর্ণ রকমে বদলে যায়, তাঁর বিশ্বাস পালটে যায়, আদর্শ ভিন্ন হয়ে যায়, ফলত: তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যান। এই মুহূর্তে কবিতার কথা ভাবছি না বলেই তাঁর কবিতার পালাবদলের কথা তুলছি না; গদ্য, গদ্যভঙ্গী মনে রেখেই আলী আহসানের সমগ্র গদ্য রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

আবার এটাও লক্ষ করবার মতো, জীবনানন্দর কবিতা ঠিক যেভাবে বদলেছে, তাঁর প্রবন্ধ, প্রবন্ধের উচ্চারণ, গদ্যের চাল, তাঁর গদ্যের মুখ সে ভাবে আদৌ বদলায়নি। বস্তুতপক্ষে জীবনানন্দর 'কবিতার কথা' বইটি ওলটালে আমাদের বিস্ময় মানতে হয়— দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত তাঁর যে কোনো দুটি প্রবন্ধ রচনাশৈলীর দিন থেকে যমজভাইয়ের মতো। অভিজ্ঞতা পরিণত হয়েছে, দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে, উচ্চারণ সংহত হয়েছে—কিন্তু অভিব্যক্তি চেনার বাইরে চলে যায়নি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের দিকে তাকিয়ে, সম্ভবত এই প্রথম একটি ব্যতিক্রম আমার চোখে ধরা পড়েছে। তা হলো, এই লেখকের মনের কাঠামো একই থেকে যাওয়া সত্ত্বেও, মৌলিক কোনো পরিবর্তন-তাঁর রুচি ও বিশ্বাসের জগতে অনুষ্ঠিত না হলেও, তাঁর প্রবন্ধের গদ্য কিন্তু বদলে গেছে তিরিশ থেকে পশ্চাশ, এই দুই দশকের ভেতরে। 'কালের পুতুল' এবং 'মহাভারতের কথা' পাশাপাশি রাখলে আমরা দেখব—প্রবন্ধ লেখকেরও গদ্য বদলে যায়, যেতে পারে। আমার সন্দেহ, বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে এই বদল সম্ভব হয়েছে পাঠকের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্বোধনের দূরত্ব এবং কোণ বদলে নিয়েছেন বলেই।

১১. দূরত্ব নির্মাণ

একমাত্র নিজের দিনপঞ্জী আর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে লেখা নোট ছাড়া মানুষ সব ক্ষেত্রেই কাউকে না কাউকে উদ্দেশ্য করেই কিছু লেখে। সাহিত্য থেকে ক্ষণকালের জন্যে সরে এসে মানুষের ব্যক্তিগত গদ্যের দিকে তাকানো যাক। দিনপঞ্জী এবং স্মারক— এ দুই যাঁদের লেখার অভ্যেস আছে, লক্ষ করে দেখবেন, সেখানেও নিজের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব কল্পনা করেই তাঁরা লিখে যাচ্ছেন। মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে মানুষ একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিবহির্ভূত বলে চিহ্নিত করতে পারছে।

ধরা যাক, প্রিয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে আজ আমি অবহেলা পেলাম, তার বাড়িতে গিয়ে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনাটি পেলাম না; এই কথাটি দিনপঞ্জীতে যখন লিখি তখন অভিজ্ঞতাটি আর আমার থাকে না, তখন সে অভিজ্ঞতা আমার অব্যবহিত পূর্বের কোনো অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা, আর তাই মনের ভেতরে আমি ঘটনাটির অভিনয় দেখতে সক্ষম হই, ঘটনার শরীরে ধৃত অভিজ্ঞতাটি বা অনুভূতিটি একই সঙ্গে আমার এবং অন্য কারো বলে অনুভব করে উঠি— আমার কলম দিনপঞ্জীর পাতায় এগিয়ে চলে।

যদি এই দূরত্বটুকু রচিত না হয়, যখন তা হয় না, তখনি কলম থেমে যেতে চায়, শব্দের অগ্রসরণ ব্যাহত হয়, আমাদের থেমে ভেবে নিতে হয়, সে ভাবনা কেবল উপযুক্ত শব্দ সন্ধানের ভাবনা নয়, আমার বিশ্বাস, দূরত্বটুকু রচনা করে নেবারই ভাবনা সেটি। আরো সাক্ষাৎ করে বলতে পারি— সে ভাবনা 'কি ভাবে লিখব', 'কেমন করে লিখব'.'কি করে লিখলে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বর্ণনা হবে আমার
বিচারে'— এরই ভাবনা।

লক্ষ করে দেখি, এই 'কি ভাবে' 'কেমন করে' আর 'কি করে' আমাদের মনেই পড়ত না

যদি-না নিজের অভিজ্ঞতা নিজেরই জন্যে লিখতে গিয়ে এবং গিয়েও আমরা নিজের সঙ্গে দূরত্ব অনুভব না করতাম।

এই যে দূরত্ব নির্মাণ, সাহিত্যেও এই কাজটি আমরা করে থাকি। আমরা যখন গদ্য লিখি, হোক প্রবন্ধ কিংবা কাহিনী, ভ্রমণকথা অথবা আত্মস্মৃতি, যা কিছুই আমরা লিখি না কেন, পাঠকের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব আমরা রচনা বা নির্ণয় করে নিই। এই 'দূরত্ব' শব্দটিকে বিনাশী অথবা প্রতিকূল অর্থে ধরে না নিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

দূরত্ব বলতে এখানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, লেখক নিজেকে ঠিক কোথায় স্থাপন করছেন পাঠকের অবস্থান থেকে। আমি বাংলা ভাষায় রচিত চারটি উপন্যাসের নাম করছি— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্য যাঁরা হেলাফেলা করেও পড়েছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁরাও এই চারটি উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত। আমি এখন তাঁদের ভেবে দেখতে বলব উপন্যাস চারটির কাহিনী নয়, বলবার ভঙ্গী, এবং এমন আশা করা মোটেও আমার পক্ষে অন্যায় হবে না বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক গৃহিণীরাও লক্ষ করতে পারবেন যে, এই চারটি উপন্যাসের বলবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ চার রকম। তফাৎটা ভাষার নয়, সাধু কিংবা চলিত; তফাৎটা কাহিনী নির্মাণের কৌশলের নয়; এমনকি বর্ণনা ও সংলাপের বণ্টনজাত তফাৎটাও গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ নয়। তফাৎ এইখানে যে, এই চারটি উপন্যাসে চার জন লেখক চারটি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে আমাদের হাতে অভিজ্ঞতা বিতরণ করছেন।

উপন্যাস চারটি আবার পড়লে, আমি নিশ্চিত, আমার মতো আপনাদেরও চোখে পড়বে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত পৃথিবী এবং সময় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত রেখে, প্রত্যক্ষ কোন মন্তব্য করা থেকে বিশ্বস্ত রকমে বিরত থেকে, মহাভারতের সঞ্জয় চরিত্রটির মতো ঘটনা থেকে দরবারী দূরত্বে থেকেও, ঘটনাকে নির্মম নগ্নতায় অবলোকন করতে করতে বলে চলেছেন। আবার, 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ নিজেরই হাতে তৈরী কিছু প্রতিমায় যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, সেই সপ্রাণ প্রতিমাগুলো এখন তাঁকেই সকৌতুকে উপেক্ষা করে একটি জীবন যাপন করে গেছে; এবং তিনি এখন তাদের থেকে মুখ ফিরি যে ছোট্ট একটি অন্তরঙ্গ আসরে সস্নেহে তাদের ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে পাঠকের মুখোমুখি বসে আছেন এবং খুব কাছেই তাঁর আসনখানি; আর বঙ্কিমচন্দ্র একটু আগে ছিলেন পাঠকের পাশাপাশি এবং উভয়েরই দৃষ্টি একই সঙ্গে ছিল ঘটনা ও চরিত্রের দিকে।

এদিকে, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে, লেখক এবং পাঠক দু'জনের ভেতরে আমরা অনুভব করি বস্তুত কোন দূরত্বই নেই; এখানে দু'জনেই আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং ক্রমাগত সঞ্চরণশীল; এ উপন্যাসের পৃথিবী এবং সময়ের ওপর লেখকের কোন মালিকানা স্বত্ব নেই, কখনই তিনি তা দাবী করেন না, তিনি আমাদেরই স্তরে থেকে কথা বলে চলেছেন, কিন্তু তাঁর সে উচ্চারণ মনে হয় যেন আমাদেরই স্বগতোক্তি।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আমাদের সন্ধান দেয় লেখক ও পাঠকের মধ্যে আরেক ধরনের দূরত্বের। এ দূরত্ব একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দূরত্ব, যে-আত্মীয়টি জীবনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বোধ করেছেন কিন্তু সেই বিস্ময়টুকু, বিস্ময়ের পেছনে

রহস্যটুকু তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট হয় নি বলে তিনি পাঠককে, পাঠক অপরিচিত হলেও, তিনি তাঁর সঙ্গে, অতি পরিচয়ের সখ্য অনুভব করবার আন্তরিকতা ধরেন; এই পাঠককে হাত ধরে দাঁড় করান এবং ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে যেন নিজেই বুঝে নিতে চান জীবনের এই বিস্ময়ের উৎস এবং রহস্যের সূত্র।

লেখকের এই দূরত্ব, এই অবস্থানগত সম্পর্ক বন্ধন, গদ্যের ওপর কতখানি ক্রিয়াশীল তা লক্ষ করা যাবে উল্লিখিত চারটি উপন্যাসের দিকে তাকালে। এবং এই দূরত্ব যে একই লেখকের দুই রচনায় দু'রকমের হতে পারে, তা বোঝা যাবে একই লেখকের দুটি উপন্যাসের দিকে যদি আমরা তাকাই। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য'— এ দুই উপন্যাসে এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের সঙ্গে দু'রকম দূরত্ব স্থাপন করেন বলেই রচনা দুটির গদ্যভঙ্গীও সম্পূর্ন ভিন্ন।

এতক্ষণে বলা যায়, এই দূরত্ব রচনা আসলে গল্প বলার কৌশলেরই অন্তর্ভূক্ত। কৌশলটি যখন উৎরে যায়, আমরা অনুভব করি 'শেষের কবিতা'র আঙ্গিকে 'আনন্দমঠ' কখনই লেখা যেত না, কিংবা 'শ্রীকান্ত'র মতো অবস্থানবিন্দু থেকে 'পদ্মানদীর মাঝি'। আরো লক্ষ করা যায়, বলবার এই দূরত্ব লেখকের গদ্য এবং ভঙ্গীর ওপর বিশেষভাবে কাজ করে থাকে, গদ্যের চাল পালটে দেয়, গতি ভিন্ন রকম হয়ে যায়।

১২. দূরত্ব বদলে দেয় গদ্যের চাল

একই লেখকের দুটি লেখা নিয়ে কথাটা আরো খানিক বুঝে নেয়া যেতে পারে :

রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোটগল্প— 'জীবিত ও মৃত' আর 'ছুটি'। আপাতচোখে মনে হবে দুটি গল্পই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন একই অবস্থানবিন্দু থেকে, অর্থাৎ দুটি গল্পই তিনি বলছেন পাঠক থেকে এক নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রেখে; লেখক এর কোনটিতেই নিজে কোন চরিত্র নন, যেমন তিনি ছিলেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে মিনির পিতা; কিন্তু একটু ভালো করে পড়লেই আমরা আবিষ্কার করব— না, একইভাবে বলা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মনে হওয়াটা ভুল; সম্পূর্ণ ভিন্নভিন্নদূরত্বে লেখক নিজেকে এই গল্প দুটিতে রেখেছেন।

'জীবিত ও মৃত' গল্পটি বলা হয়েছে এমনভাবে যেন লেখক ঘটনাটি শুনেছেন, কিন্তু ঠিক পুরো শোনেননি, যতটুকু শুনেছেন তার ভেতরকার যুক্তিতর্কের সিঁড়িও যেন তাঁর কাছে সব সময় স্পষ্ট নয় এবং শ্রোতা পাছে কোথাও অবিশ্বাস করে বসেন তাই লেখকের ভেতরে এক ধরনের ব্যাকুলতা করা যায়, যে-ব্যাকুলতা থেকে তিনি নিজেই মাঝে মাঝে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি সরবরাহ করবার চেষ্টা করে চলেছেন।

এই সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে 'জীবিত ও মৃত' গল্পের তিনটি ব্যক্যে। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য, 'সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সময়মতো পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়।' এই বাক্যটির শুরুতেই 'সকলেই জানেন' লক্ষ করা দরকার; রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলেই এ দুটি শব্দ বাদ দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি এবং আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনের অনুরোধে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তিনি শব্দ দুটি লিখেছেন; আর এতেই

আমরা যেন গল্পের বক্তাটিকে এক পলকের জন্যে দেখে নিতে পারছি, যিনি আমাদের মনে ক্ষণকালের অবিশ্বাস দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি তথ্য জানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় বাক্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষ দিকে, 'সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা।' বলে দিতে হবে না, এখানে ঐ 'জানি না' কথাটি একেবারে স্পষ্ট করে দিচ্ছে পাঠক থেকে লেখকের দূরত্বটুকু; এখানেও রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলেই 'জানি না' কথাটি কেটে দিতে পারতেন; দেননি। আর গল্পের শেষ বাক্য, সেই বিখ্যাত বাক্য যা এখন আমাদের মুখে প্রবচনে পরিণত— 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' এই বাক্যটি কি আমাদের নিশ্চিত করে দিচ্ছে না, বক্তার উপস্থিতি? এবং এমন একজন বক্তা যিনি এতক্ষণ নিজেই অনুভব করেছেন যে, হয়ত তাঁর শ্রোতারা গল্পটি অবিশ্বাসের সঙ্গে শুনে এসেছে, তাই এখন তিনি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, সবচেয়ে মর্মান্তিক ও নির্মম প্রমাণটি ছুঁড়ে দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমাদেরই দিকে এবং তাঁর নিজের চার দিকে এখন কল্লোলিত হয়ে যাচ্ছে একটি হাহাকার।

এর পাশাপাশি 'ছুটি' গল্পটি পড়লে আমরা দেখব, লেখক দাঁড়িয়ে আছেন খাঁটি নিরপেক্ষ দূরত্বে, কোথাও তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে সমুখে আনেন নি, যুক্তি সরবরাহ করেন নি, পাঠকের কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা গণনায় এনে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এখানে লেখক প্রথম বাক্য থেকেই জানেন গল্পের কি পরিণতি; আর তাই প্রথম বাক্যটিই তিনি দীর্ঘ করে লিখলেন। এই প্রথম বাক্যে যে তিনটি বাক্যাংশ আছে, অনায়াসে দাঁড়ি ব্যবহার করে তিনটি বাক্যে তা ভেঙে নেয়া যেত, নিলেন না। তিনি লিখলেন, 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।' দীর্ঘ এই বাক্যগঠন বারবার ফিরে এসেছে 'ছুটি' গল্পে; আর এটা যখন লক্ষ করি তখন আমরা বুঝে ফেলি যে, একটা দীর্ঘশ্বাস ভেতর থেকে কাজ করে চলেছে, কৈশোর-মৃত্যুর মেঘ এসে ছায়া ফেলছে, এই মৃত্যুর কি আবশ্যকতা ছিল, ঈশ্বরের তাতে কোন দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য সাধিত হল— এই বেদনা সঞ্চারিত করে দেবার জন্যেই, আমার অনুমান, রবীন্দ্রনাথ 'ছুটি' গল্পে গদ্যের চাল এ রকম নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন।

'ছুটি' গল্পের যে কোনো একটি অংশ যদি এ রকম হয়— 'কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত, ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।'— তাহলে এর পাশাপাশি পড়া যাক 'জীবিত ও মৃত' গল্পের যে কোনো একটি অংশ— 'এমন সময়ে তাহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একবার ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।'

আমাদের বলে দিতে হয় না, দুই অংশে গদ্যের চাল দু'রকম, গঠন দু'রকম, যতি পড়ছে

দু'রকম। 'ছুটি'র গদ্য যেখানে দীর্ঘশ্বাস জড়ানো এবং ধীর, 'জীবিত ও মৃত'-এর গদ্য সেখানে থেমে থেমে চমকে চমকে এগিয়ে চলেছে। আমরা অনুভব করি, 'ছুটি'র মতো করে 'জীবিত ও মৃত' লেখা যেত না, কিংবা 'জীবিত ও মৃত'—র মতো করে 'ছুটি'। আমরা আরো ভেতরে তাকিয়ে দেখি, লেখক এ দুটি গল্পে পাঠক থেকে দু'প্রকার দূরত্বে অবস্থান করছেন বলেই আপাত চোখে এক আঙ্গিকের গল্প বলে মনে হলেও আসলে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন; আর এই ভিন্নতার অস্থি লক্ষ করা যাবে এ দু'টি গল্পের গদ্যের শরীরেই— আর কোথাও নয়।

১৩. গল্পে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপ

গল্প বলবার কৌশলের ভেতরে একটি বড় প্রশ্ন লুকিয়ে রয়েছে— ক্রিয়াপদের কোন্ রূপটি ব্যবহার করব? বাংলার আগে ইংরেজির দিকে তাকানো যাক। ইংরেজি ভাষায়— এই ভাষাটির সঙ্গে মাতৃভাষার পরেই আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়— গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখকেরা ক্রিয়াপদের যে কালরূপটি ব্যবহার করেন তা হচ্ছে 'পাস্ট ইনডেফিনিট' অর্থাৎ সাধারণ অতীত– সিলভিয়া ঘরে ঢুকল, পিটার বলল, জেনি হাত থেকে রুমালটা ছিনিয়ে নিল; ইংরেজি কথাসাহিত্যে ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপটি সেই আদি থেকে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
বাংলাতেও এই সাধারণ অতীত গল্প বলায় বারবার ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। লক্ষ না করে পারি না, মা যখন শিশুকে রূপকথা বলেন, সে রূপকথার ক্রিয়াপদগুলো সাধারণ অতীত; রাজপুত্র আস্তে করে দরোজা খুলল; দেখল সোনার খাটে শুয়ে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যা। ভারতবর্ষের আদিকাব্য মহাভারত, যার ভেতরে এই ভূখণ্ডের বহু উপখ্যানের মূল কাঠামো আমরা আবিষ্কার করতে পারি, সেখানেও আদি কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপটি মূল কাঠামো হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।
রাজ শেখর বসুর অনুবাদ থেকে— 'কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহৃদগন রয়েছেন দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যুদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুখোচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে।'
কাহিনী বলতে গিয়ে ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীতকাল রূপটিকে মূল বলে আশ্রয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছুটি' গল্প থেকে— 'এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা মানিক আমার।' ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।' মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।' ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'
আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আদি এক প্রধান স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্রও ক্লান্তিহীনভাবে ব্যবহার করেছেন ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীতকাল রূপ। তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস

থেকে— 'প্রতাপ ডাকিল, 'শৈবলিনী— শৈ।' শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল— হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে 'শৈ' অথবা 'সই' বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, প্রতাপ, আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?'
তারাশঙ্কর, তাঁরও প্রিয় ক্রিয়াপদের এই সাধারণ অতীত কালরূপ। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' থেকে— 'মুখ খুলেছিল পানু, কিন্তু তার আগেই একটা সুঁচালো বাঁশীর শব্দ বেজে উঠল। সেই শিসের শব্দ। শব্দটা আসছে— বাঁশবাদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশ বন থেকে। সকলে চকিত হয়ে কান খাড়া করে চুপ করে রইল। বনওয়ারি বসে ছিল উত্তর মুখ করে, বাঁ হাতে ছিল হুঁকো— সে ডান হাতটা কাঁধের উপর তুলে, পিছনে তর্জনীটা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিলে সকলকে। পিছনে দক্ষিণ দিকে বাঁশ বেড়ের মধ্যে শিস বাজছে। আবার বেজে উঠল শিস। ওই।'
লক্ষ করে দেখব আজো বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে যত গল্প উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, সন্দেহ হয়— রক্তেরই অন্তর্গত একটি বোধ দ্বারা চালিত হয়ে— ব্যবহার করে চলেছেন ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ। লেখার মূল কালরূপ যে এটাই তা কি এই কারণে, যে, আগুন যেমন উর্ধ্বগামী, জল যেমন নিম্নগামী, গল্পেও ক্রিয়াপদ তেমনি সাধারণ অতীত ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না?
আমার সন্দেহ আছে। আমার পড়াশোনা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে, ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপও অনেক লেখকই ব্যবহার করেছেন এবং অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনামণ্ডিত সেই সব ব্যবহার— ব্যবহার করেছেন এই নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ কোনো কোনো লেখক কখনো কখনো, আবার কোনো কোনো লেখক সব লেখাতেই। এবং আমার নিজের লেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাংলা গল্প উপন্যাস বা কথকতায় ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপটিও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'কাঁদো নদী কাঁদো' থেকে— 'কি কারণে তবারক ভূঁইয়া থামে। বাইরে, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে, নদীর বিক্ষুব্ধ অশ্রান্ত পানি আর্তনাদ করে। সে-আওয়াজই সহসা কানে এসে লাগে। শ্রোতাদের মধ্যে একজনের চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে, মুখটা ঈষৎ খুলে সোজা হয়ে বসে সে ঘুমায়। শান্ত মুখ, তাতে ঘুমের কোনো ছায়া নেই। তাই মনে হয় সে বুঝি জেগেই চোখ বুঁজে রয়েছে, অথবা সে অন্ধ। তারপর আবার তবারক ভূঁইয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।'

১৪. ক্রিয়াপদের কালরূপে তৈরী হয় জাদু

বাংলাভাষায় গল্প উপন্যাসে ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ প্রধান; নিত্যবৃত্ত বর্তমান রূপটিও উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; এ ছাড়া ইংরেজিতে যা দেখি না, বাংলায় আমরা পুরাঘটিত বর্তমান এবং পুরাঘটিত অতীত –অর্থাৎ সে বলেছে, সে করেছে এবং সে

বলেছিল, সে করেছিল —এ দু'টোকেও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছি। কাজে কোনটা কম কোনটা বেশি লাগালেও গল্পে ক্রিয়াপদের এতগুলো কালরূপ যে বাংলা লেখকের হাতে রয়েছে— এর একটা মস্ত বড় লাভের দিক আছে।

আবার এই লাভের দিকটাতেই রয়েছে মেঘ ও ঝড়। অস্ত্র বিভিন্ন হলে তাদের প্রয়োগ-পদ্ধতি তো বটেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রও ভিন্ন হতে বাধ্য। ক্রিয়াপদের কোন কালরূপ ব্যবহার করব, সচেতনভাবে বুঝে না নিলে এবং প্রতিভার আলোয় নির্ণয় করে নিতে না পারলে বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের শক্তিকেই আমরা জং ধরিয়ে দেব।

তথ্যটি সাধারণ ও সরল, কিন্তু শুনে চমকে উঠতে হয় যে, মানুষের হাজার হাজার ভাষার ভেতরে বহু ভাষা আছে যাদের কোনো লিপি নেই, অথচ এমন একটিও ভাষা নেই যার অস্তিত্ব কেবল লিপিতেই, মুখে নয়। এই থেকে এই কথাটিই কি আমাদের মনে আসে না, যে, ভাষার এবং সেই কারণেই সাহিত্যিকের লেখা যে কোনো বাক্যের মূল আবেদন কানের কাছেই?

গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়াপদের কালরূপ, বাংলাভাষায় যেগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার ভেতরের শক্তি এবং রঙ বুঝতে হলে, আমি অনুরোধ করব নিচের উদাহরণটি উচ্চারণ করে পড়ে দেখতে। আমি আরো যা করতে চাই, একই অংশ বিভিন্ন কালরূপে রচনা করে দেখব এবং ধারণা নিতে চেষ্টা করব যে, ঐ বিভিন্নতার দরুণ শিল্পের দিক থেকে, মর্মের কাছে আবেদনের দিক থেকে, কি ভাবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সচেতন এবং সবচেয়ে মৌলিক ঔপন্যাসিকদের একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি ছোটগল্প— 'স্তন'। গল্পটি তিনি লিখেছেন তাঁর প্রিয় কালরূপ নিত্যবৃত্ত বর্তমান ব্যবহার করে। এই গল্পের শেষ দিকের অংশ পড়া যাক।

'মাজেদা আর দেরী করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচ থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়, তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ম ব্যথা তীরের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তবে সে টু শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবার সে মর্মান্তিক ব্যথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে সে নিজেকে সুস্থির করে। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।'

এবারে এই একই অংশ লিখে দেখা যাক ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে— যে কালরূপ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই, বাংলায় তো' বটেই, লেখকদের এত প্রিয়; ব্যাসদেব, হোমার থেকে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। নীচের অংশটুকু উচ্চারণ করে পড়া যাক এবং ওপরে ওয়ালীউল্লাহর মূলের উচ্চারণ-বিভার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক।

'মাজেদা আর দেরী করল না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে

প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করল। বালিশের নীচ থেকে একটু হাতড়ে তুলে নিল মাথার সরু একটি দীর্ঘ কাঁটা। তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ তীরের মতো ঝলক দিয়ে উঠল সুতীক্ষ্ম একটি ব্যথা। নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল সহসা। তবে সে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে দিল। আবার জেগে উঠল মর্মান্তিক সেই ব্যথা। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হল, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে নিজেকে সে সুস্থির করল। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা করলেও সে বুঝতে পারল, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু হয়ে গেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দুর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।'

লক্ষ করে দেখব, ক্রিয়াপদের কালরূপ বদলাতে গিয়ে কিছু শব্দের অবস্থান বদলাতে হয়েছে— এটা করতেই হয়, কালরূপ কিছু দুরকম টুপি নয় যে একটা খুলে আরেকটা সহজেই পরে নেয়া যায়; ক্রিয়াপদের কালরূপ বাক্যের ভেতর থেকে কাজ করে, বাক্যের দোলা বদলে দেয়। আশা করি, উচ্চারণ করে পড়বার পর দোলার এই তফাৎ কানে ধরা পড়েছে।

একই অংশ এবার আরেকটি কালরূপ প্রয়োগ করে দেখা যাক— ক্রিয়াপদের পুরাঘটিত অতীত কালরূপ। এটিও আমাদের ভাষায় অনেক লেখকের কাছে প্রিয় একটি কালরূপ।

'মাজেদা আর দেরী করে নি। তার সময় ছিল না। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম উন্মুক্ত করেছিল, প্রথমে ডান স্তন তারপর বাম স্তন। তারপর বালিশের নীচ থেকে তুলে নিয়েছিল মাথার একটি সরুদীর্ঘ কাঁটা। এবং নিষ্কম্প হাতে ক্ষিপ্রভাবে কাঁটাটি সে বসিয়ে দিয়েছিল কুচাগ্রের মুখে। তৎক্ষণাৎ তীরের মতো ঝলক দিয়ে উঠেছিল সুতীক্ষ্ম একটি ব্যথা। নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সহসা চতুর্দিক। তবে সে টু শব্দটি করেনি। আরো একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে দিয়েছিল। আবার জেগে উঠেছিল মর্মান্তিক সেই ব্যথাটি। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়েছিল, সে চেতনা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে নিজেকে সে সুস্থির করে রেখেছিল। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পেরেছিল, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু হয়েছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়ে গেছে। স্তন থেকে দুধ সরতে তখন আর বাধা ছিল না।' আমার বিশ্বাস, যে কোনো সতর্ক পাঠক প্রথমে মূল এবং পরে দুটি পাঠান্তর উচ্চারণ করে পড়বার পর অবশ্যই ধরতে পারবেন, ক্রিয়াপদের কালরূপের ভিন্ন প্রয়োগ ভিন্ন সুরের জন্ম দিচ্ছে, ঘটনা থেকে একেক দূরত্বে আমাদের স্থাপিত করছে, ঘটনার ব্যাপ্তিও কমে যাচ্ছে কি বেড়ে যাচ্ছে, বস্তুত পক্ষে নির্মিত বিশ্বটারই বর্ণ-বদল ঘটছে।

১৫. কালচেতনা ও কালরূপ

ক্রিয়াপদের কালরূপ নিয়ে কথা বলছিলাম আমার লেখক জীবনের প্রথম পনেরো বছর

প্রায়— ক্রিয়াপদের সেই কালরূপ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না; এখন অনেক মাশুল দেবার পর, এতটুকু বলবার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে মনে করি যে, বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদের যতগুলো কালরূপ আছে তার ভেতরে সাধারণ অতীত কালরূপটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও এখন আমাদের এই সময়ে, বাংলা গল্প উপন্যাসের আসন্ন যৌবনপ্রাপ্তির এই মুহূর্তে, আমাদের উচিত ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপটি চিন্তার জটিলতা যতখানি ধারণ করতে সক্ষম, সাধারণ অতীত কালরূপ তার ধারে কাছেও যেতে পারে না। সত্য, রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো লেখক সাধারণ অতীত কালরূপ প্রায় আজীবন ব্যবহার করেছেন, অত্যন্ত সাফল্য এবং মৌলিকত্বের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু সেই তিনিও জীবনের শেষভাগে বহু রচনায়, বিশেষ করে নাতিদীর্ঘ কাহিনীগুলোতে, নিত্যবৃত্য বর্তমান কালরূপটিতেই বারে বারে ফিরে গেছেন; এবং অন্যত্র, যেখানে তিনি যাননি, সেখানেও ক্রিয়াপদের কালরূপে নিত্যবৃত্ত বর্তমানের সুর লেগেছে। এটা আকস্মিক নয়। আর দশটা বছর তিনি বেঁচে থাকলে, আমরা হয়ত দেখতাম গল্প উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অতীত একেবারেই বর্জন করেছেন। আমার এই অনুমানের কারণ, চল্লিশ দশকেই বাঙলা গল্প উপন্যাস কিশোর এবং স্বল্পশিক্ষিত গৃহিনীদের পাঠ্যতালিকা ছাড়িয়ে সাবালকের মস্তিষ্কের দিকে যাত্রা শুরু করেছে; আর, এই সময়ে যখন কাহিনী আর কোনো কথাই নয়, মনের ভেতরটাই হচ্ছে ক্ষেত্র, এই সময়ে যখন মানুষ যাচ্ছে অনেক বর্জন আর গ্রহণের ভেতর দিয়ে, এই সময়ে যখন মানুষ তার অস্তিত্বকে রাজনৈতিক এবং দার্শনিক দুই দিক থেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, তখন অনিবার্যভাবেই আমাদের সেই অভিজ্ঞতা বহনের উপযোগী ভাষা এবং কাঠামোও তৈরি করে নিতে হচ্ছে বা নেয়া কর্তব্য। সেই কর্তব্যের একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক—ক্রিয়াপদের কালরূপ সম্পর্কে নতুন ভাবনা করা।

আমার মনে হয়, ঠিক এই ভাবনাটিই প্রয়াত কমলকুমার মজুমদারকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি মুখের ভাষার ভেতরে জটিলতা ধরে রাখবার উপায় হিসেবে মুখের ভাষাকেই বর্জন করে সাধু ভাষার আতিথ্য স্বীকার করেন। তা যদি তিনি না করতেন, যদি মুখের ভাষা থেকে সরে না আসতেন, আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছ থেকেই আমরা বাংলা ক্রিয়াপদের কালরূপের প্রতিভাময় ব্যবহার দেখতে পেতাম।

১৬. ক্রিয়াপদের কালরূপ নির্বাচন

ক্রিয়াপদের কালরূপ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ওটা গল্পের সুর বেঁধে দেয়। লেখক ঠিক কিভাবে কোন পথে বিষয়টির ভেতরে আমাদের নিয়ে যেতে চান এবং বিষয়টির সঙ্গে কোন দূরত্বে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে চান, ক্রিয়াপদের কালরূপ দেখেই তা সনাক্ত করা যায়।

লেখক ভিন্ন ভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন কালরূপ ব্যবহার করতে পারেন, সেটা তিনি করবেন লেখাটির সঙ্গে পাঠকের যে দূরত্ব তিনি নির্ধারণ করেছেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে; আবার কোনো লেখক ক্রিয়াপদের একটি মাত্র কালরূপকেই তাঁর সারাজীবনের অবলম্বন করতে

পারেন। যদি আমরা দেখি যে, কোনো লেখক গল্পের পর গল্পে ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ কালরূপই ব্যবহার করে চলেছেন তাহলে তা থেকে আমরা তাঁর বিশেষ একটি প্রবনতাই আবিষ্কার করে নিতে পারি, জীবন ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর একটি দৃষ্টিভঙ্গীও আমরা সাধারণভাবে চিনে নিতে পারি।

ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপটাই লেখকদের হাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এই অংশটি—সে ঘরের ভেতর এলো। দেখল ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় গেল, সেখানেও কেউ নেই। তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। সে চুপ করে বিছানার ওপর বসে রইল, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে লেখা এই অংশটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি লেখক চান 'সে' চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘরে ঢুকি, ঢুকে চরিত্রটির সঙ্গেই আবিষ্কার করি যে ঘর শূন্য, তারই পাশাপাশি হেঁটে আমরা বারান্দায় যাই এবং ফিরে এসে তারই মতো কারো জন্যে অপেক্ষা করি। অর্থাৎ, ঘটনাটি আমাদের খুব কাছে এবং চোখের ওপরই ঘটছে, এবং এক্ষুনি, এই মাত্র তা ঘটে গেল।

কিন্তু এই অংশটুকুই যদি ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ ব্যবহার করে লেখা যায়। তাহলে কি দাঁড়ায়? 'সে ঘরের ভেতরে যায়। দেখে ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় যায়, সেখানেও কেউ নেই। তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়। সে চুপ করে বিছানার ওপর বসে থাকে, যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করে।' পড়বার সঙ্গে, সঙ্গে বিশেষ যদি উচ্চারণ করে পড়ি, তাহলে দেখতে পাই ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ অর্থাৎ 'যায়', 'দেখে' 'করে' আগেকার 'গেল', 'দেখল' 'রইল' 'করল' এগুলোর তুলনায় অনেকদূর পর্যন্ত ধাবিত হচ্ছে, এর ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস হাহা করছে, উচ্চারিত হয়েও যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে না— অনন্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর এরই ফলে আমরা আবিষ্কার করছি, চরিত্রটির শূন্যতা এবং এমনও আমাদের অনিবার্যভাবে মনে হচ্ছে যে, এ ঘটনা শুধু এখনই ঘটল বা ঘটছে তা নয়, আগেও ঘটে গেছে, এখন ঘটছে এবং আগামীতেও ঘটতে পারে কিংবা ঘটবেই।

তবে কি, ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত রূপের শক্তি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপের চেয়ে কম? তাও তো নয়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্ণমৃগ' ছোটগল্পটি; সেই যে গল্পে বৈদ্যনাথ নামে গরীব এক গ্রামবাসী স্ত্রীর তাড়নায় গুপ্তধনের আশায় কাশী পর্যন্ত গিয়েছিল তারপর প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছিল। তার শেষ অংশটি পড়ে দেখা যাক। ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত ব্যবহার করে লেখা—'রাত হইতে লাগিল কিন্তু দু'জনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম ছম করিতে লাগিল। এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড়ো ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, 'বাবা।' তখন তাহার বাবা সেখানে নাই।

অপেক্ষাকৃত উর্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, 'বাবা।' কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না। আবার ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাত হইল না।'

নিশ্চয়ই আমরা অনুভব করতে পেরেছি ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে লেখা এই অংশটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে, যে, আমরাও যেন হতভাগ্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে নিঃশব্দে গ্রাম থেকে মাঝরাতে বিদায় নিলাম, আমরাও একটি ছোট, ব্যক্তিগত কিন্তু ভয়াবহ রকমে সর্বগ্রাসী একটি অভিযোগ অনন্ত এবং উদাসীন পৃথিবীর কাছে রেখে গেলাম যে–পৃথিবীর কিছুই আসে যায় না এক বৈদ্যনাথের–কি হলো না হলো তাতে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর জীবনের প্রধান লেখাগুলো লিখে গেছেন ক্রিয়াপদের বর্তমান কালরূপ ব্যবহার করে। তিনি যে ক্রিয়াপদের বিশেষ এই কালরূপটি বেছে নিয়েছেন, জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে 'যায়', 'খায়', 'করে', 'দেখে'–র মতো অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা কালরূপ প্রয়োগ করেছেন, তা আকস্মিক নয়; কারণ তিনি সর্বাংশে সচেতন শিল্পী। তাঁর উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' ধরা যাক। সেখানে যখন আমরা একটু সতর্ক হলেই আবিষ্কার করি যে, প্রধান চরিত্রটির নাম মুহম্মদ মুস্তফা, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের যে নাম সেই নাম—সর্বশেষ আরো যখন দেখি যে উপন্যাসে মুস্তাফার স্ত্রীর নাম খোদেজা, যে নাম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের প্রথম স্ত্রীর নাম, তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত সচেতনভাবেই নদীর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে একটি প্রতীক রচনা করতে চেয়েছেন; আর সেই প্রতীকটিকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের শেকল থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত বর্তমান রূপটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায়টি ক্রিয়াপদের অন্য কোনো কালরূপ দিয়ে সিদ্ধ হতো না। তা যে হতো না সেটা বোঝা যাবে এ বই থেকে যে কোনো একটি অংশ পড়ল। যেমন এটুকুই পড়ি না কেন?—

'নিঃসন্দেহে কোথাও কে যেন কাঁদে—তা কি আর বিশ্বাস করা যায়? অবিশ্বাসটি ধীরে ধীরে কমজোর হয়ে ওঠে, অবিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর সন্দেহের দোলায় দুর্বল হয়ে পড়ে, কেউ কেউ আবার তা নীরবেই সহ্য করতে শুরু করে, যেমন দুঃখ কষ্টে মতিভ্রষ্ট মানুষের যুক্তিহীন বিলাপ অসহ্য মনে হলেও অনেকে নীরবে সহ্য না করে পারে না। হয়ত তাদের মনে হয় রহস্যময় দুনিয়ার সবকিছু তারা জানে না। হয়ত সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে সব মানুষের মনে একটি আশা লুকিয়ে থাকে যে হঠাৎ একদিন অলৌকিক কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে, সে–আশাটিই হঠাৎ জেগে ওঠে। কাল্পনিক খাদ্যে মানুষের যেমন পেট ভরে না, তেমন যা ধরতে পারে না ছুঁতে পারে না চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হয় না—তাতে বিশ্বাস রেখেও মানুষের চিত্ত ভরে না। যে কান্না এত মানুষ শুনতে পায় সে–কান্নার কথা সত্যি অবিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়; সে–কান্না সত্যের রূপই গ্রহণ করে—এমন একটি সত্য যা ব্যাখ্যা করা যায় না। অবিশ্বাস করা যায় না বলে ভয়টিও বাড়ে, মনের গভীর আশঙ্কাটি ঘনীভূত হয়। কে কাঁদে? মোক্তার মোছলেহ উদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে বিস্ময়কর কথাটি বলেছিলো তা সবাই যথাসময়ে শুনতে পেয়েছিল কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়, নদী কি করে কাঁদে?'

১৭. একই লেখায় যখন ক্রিয়াপদের একাধিক কালরূপ

গল্প উপন্যাসে ক্রিয়াপদের কালরূপ নিয়ে আলোচনা করে যাবার কালে আমার একটা ছোট্ট আশঙ্কা ছিল; সেটা এই যে, কেউ মনে করে বসতে পারেন আমি একটি গল্পে ক্রিয়াপদের একটিমাত্র বিশেষ কালরূপ দেখতে চাই—মিশ্রণ ঘটলে তা দোষের হবে। আশঙ্কাটি সত্যি হয়েছে। একজন জানতে চেয়েছেন, একই লেখায় ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপ ব্যবহার করা কি সম্ভব? অথবা উচিত?

অবশ্যই সম্ভব এবং প্রয়োজনের ওপরেই এর ঔচিত্য নির্ভর করছে। এই প্রয়োজনটা যদি ঠিক মতো আমরা সনাক্ত করতে না পারি তাহলে যে ভুল হয় তার ফলে লেখাটিই গন্তব্যভ্রস্ট হয়।

আসলে—একটা মূল কাঠামো ঠিক করে নিতে হয়; কাহিনীটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কিংবা সাধারণ অতীত অথবা অন্য কোনো একটি কালরূপে বর্ণনা করব এটা আমার বক্তব্যের সুর, ভঙ্গী এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করে নেয়াটাই হচ্ছে কাঠামোর কাজ। তারপর সেই কাঠামোর ভেতরে থেকে, আমাকে গল্প বলে যাবার জন্যে অবশ্যই কখনো এগিয়ে যেতে হবে, কখন পেছিয়ে আসতে হবে, কখনো বা দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতে হবে ঘটনার প্রবাহ, আর এই সব মুহূর্তেই মূল কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে আমাকেও বেছে নিতে হবে ক্রিয়াপদের অন্যতর কালরূপ।

দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি । এর মূল কাঠামো ক্রিয়াপদের সাধারণ কালরূপ। কিন্তু গল্পটি শুরু হয়েছে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপ দিয়ে। যেমন—'আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না।'

আবার কিছুদূর এগোবার পর দেখি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করছেন, এই একই গল্পে, ক্রিয়াপদের ঘটমান বর্তমান কালরূপ। যেমন, 'কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলা আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো–আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।'

বেশিদূর যেতে হবে না, এই গল্পেই এরপর দেখব ক্রিয়াপদের নিত্যবৃত্ত অতীত কালরূপও কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন, 'রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, 'কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা তোমার ও ঝুলির ভিতর কি?' রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, 'হাঁতি।' কিন্তু ক্রিয়াপদের বিভিন্ন এই কালরূপগুলো ব্যবহার করা হয়েছে গল্পটির মূল কাঠামো সাধারণ অতীতেরই ভেতরে। আর এই মূল কাঠামো টের পাই যখন আমরা পড়তে থাকি—'আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই। তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া

তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, 'কিরে রহমত, কবে আসিলি?' এবং মর্মস্পর্শী শেষ দু'টি অনুচ্ছেদ—'আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলন-সুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।' এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।'

গল্প উপন্যাস যাঁরা পড়েন তাঁদের কাছে ক্রিয়াপদের কালরূপ কতটা ধরা পড়ে—আমি অর্ধমনস্ক পাঠকদের কথা এখন ভাবছি—সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। কিন্তু লেখককে নিশ্চিত না হলে চলে না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, বক্তব্যের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে ক্রিয়াপদের কালরূপ। কালরূপটি ঠিক লাগসই না হলে কথার ধার অনেকখানি ক্ষয়ে যায়—সাহিত্যের যে অপরপক্ষ, অর্থাৎ পাঠক, তাঁর মনে লেখক যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে চান সেই তরঙ্গের আকার এবং প্রকার দুই-ই অনভিপ্রেত রকমে ভিন্ন হয়ে যায়। আর তাই, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র মূল কাঠামো সাধারণ অতীত বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান হলে 'পদ্মানদীর মাঝি' বলতে যা বুঝি তা আর হতো না; তেমনি আরেক উদাহরণ দিই, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'কাঁদো' নদী কাঁদো' হয়ত নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালরূপের কাঠামোয় না লিখে সাধারণ অতীত ব্যবহার করে লেখা যেত, কিন্তু তাতে করে বাকাল নদীর মৃত্যু যে-কোনো মানুষের মৃত্যুর মতই জীবনের সমস্ত প্রদীপ নেভানোর মতো অন্ধকার ডেকে আনতে পারত না।

লেখকের দক্ষতা বা মিস্তিরির নিপুণ হাত এখানেই যে, তিনি তাঁর মনোনীত কালরূপের কাঠামোর ভেতরে ভিন্নতর কালরূপ অনায়াসে নির্ধারণ করে নিতে পারেন। বাংলা ভাষার বহু লেখক এমনকি তাঁদের প্রধান রচনাতেও অনেক সময় তা পারেন নি। বাংলাদেশে তো সাধারণ এই নৈপুণ্যের অভাবটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮. গল্পের শরীরে সংলাপ

উনিশ শো উনসত্তরের দিকে 'চিত্রালীর' কোন এক সংখ্যায় একটি ছোটগল্প লিখেছিলাম, লেখাটির নাম ছিল 'সে' এবং এতে একটিও সংলাপ ছিল না। তখন পর্যন্ত গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের কখন দরকার, কেন দরকার, কোথায় দরকার—এসব নিয়ে সচেতনভাবে কিছু ভাবতাম না, বরং বলা চলে, লেখার সময় কলমের টানের ওপরই ভরসা রাখতাম—কলমের টানে সংলাপ এলো তো এলো, না এলো তো নেই। এমনকি এই 'সে' গল্প—যার কপি বহুদিন আগেই আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, —এই গল্পটি লেখার সময়েও আমি এটা ঠিক করে লিখতে বসিনি যে এতে একটিও সংলাপ থাকবে না। আমার গল্প ছিল এক ধনবান ব্যবসায়ীকে নিয়ে; অভিজাত একটি এলাকায় সুন্দর একটি বাড়িতে সে থাকে; তার আছে চমৎকার একজন স্ত্রী আর দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এমন একটি ছেলে। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন একটি অসুখে সাময়িকভাবে পঙ্গু

হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে; শুয়ে শুয়ে সে তার চারদিকে সংসারের স্রোত বয়ে যেতে দেখে; এবং একদিন সে লক্ষ করে সে নিজেই কখন একটি আসবাবে পরিণত হয়ে গেছে; বাড়িতে সে আছে কি নেই এটা আর কারো কাছেই কোনো সংবাদ নয়। একদিন সে যখন নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে, সম্ভবত তার পরিচিত সমস্ত প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে যায়, তখনো কেউ তার অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারে না। এই ছিল গল্পটি। আমি শুরু করেছিলাম প্রধান চরিত্রটি যখন শয্যাগত তখন থেকে; গল্পটিকে দেখেছিলাম তাঁর চোখ থেকে; আমার এমন একটা ইচ্ছে ছিল পাঠক ও প্রধান চরিত্রের ভেতরে কোনো দূরত্ব থাকবে না। যেহেতু চরিত্রটি নীরবে সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে, তাই কলমের টানে আর সংলাপ আসেনি; সমস্ত কিছু ঘটে গেছে অখণ্ড নীরবতার ভেতর দিয়ে।

গল্পটি ছাপা হয়ে যাবার কয়েক সপ্তাহ পর আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, এই আমার প্রথম একটি গল্প যাতে কোনো সংলাপ নেই। এবং সেই মুহূর্ত থেকেই, এখনো সনাক্ত করতে পারি, আমি প্রথম সচেতন হই গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার সম্পর্কে। আমার মনে আছে নিজের পুরনো কিছু লেখা তো বটেই, আমি যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদের লেখাগুলো আবার আমি দ্রুত পড়ে ফেলি ঐ সংলাপ ব্যবহারের প্রয়োজন ও কৌশল বুঝে নেবার জন্যে। হতাশার সঙ্গে আবিষ্কার করি যে, আমার অধিকাংশ পুরনো লেখাতেই আমি বড় অবহেলার সঙ্গে, অমনোযোগের সঙ্গে সংলাপের মতো প্রধান একটি হাতিয়ারকে ব্যবহার করেছি। বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সেই সংলাপ—'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'—সাধুভাষার দূরত্ব সত্ত্বেও কেন আমাদের কানে সদ্য শোনা উচ্চারণের মতো অবিরাম ধ্বনিত হতে থাকে; আর কেনই বা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে মেহের পাগলার 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়' আমাদের কাছে এই দুর্বোধ্য, বিশাল, প্রতিরোধহীন জীবনের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া একটি ব্যর্থ কিন্তু রক্তাক্ত মন্তব্যের মতো মনে হয়।

অনিবার্যভাবে সংলাপ তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ দখল করে বসে। আমার মনে পড়ে যায়, বহুবছর আগে একটি গল্প পড়েছিলাম, সম্ভবত সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখা। সে গল্পে, আবছা মনে পড়ছে, চরিত্রের মুখে শোনা একটি সংলাপের পাশে ব্র্যাকেটে আর একটি করে সংলাপ লেখা ছিল। লেখকের অভিপ্রায় ছিল এই যে, চরিত্রটির যে সংলাপ ব্র্যাকেটের বাইরে তা উচ্চারিত, আর ব্র্যাকেটের ভেতরে যে সংলাপ তা সেই মুহূর্তে তার মনের অনুচ্চারিত কথা। বানানো উদাহরণ এই রকম দেয়া যেতে পারে যে—আমি চাইছি সে চলে যাক কিন্তু সামাজিকতার খাতিরে তাকে বসতে বলছি—'কি খবর কতদিন পরে দেখা। (কেন এসেছ? আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।)' লোকটি হয়ত এসেছে আমাকে ধার পরিশোধের তাগাদা দিতে, তাই বলছে—সামাজিকতায় সেও কম যায় না—'এই এলাম, অনেকদিন দেখা হয় না। (আমার টাকাটা এখনো ফেরত পাইনি!)' আমার মনে পড়ে যায়, এই গল্পটি পড়বার পর আমি কিছুদিন একটি বীজ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম। ভেবেছিলাম এমন একটি গল্প লেখা কি সম্ভব নয় যার বেশির ভাগ জুড়ে থাকবে সংলাপ?—আর সেই সংলাপও সরল হবে না; প্রতিটি সংলাপের ব্র্যাকেটে থাকবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বক্তব্য নিয়ে সংলাপ। এমনও মনে হয়েছিল তখন, যে, একটি গল্প এভাবে লেখা হয়ত সম্ভব, ব্র্যাকেটের বাইরে অর্থাৎ উচ্চারিত সংলাপগুলো পড়ে গেলে

একটি গল্প জানতে পারব, আর শুধু ব্র্যাকেটের ভেতরে অর্থাৎ অনুচ্চারিত সংলাপগুলো পড়ে গেলে ভিন্ন একটি গল্প পাব এবং এখানেই শেষ নয়—ব্র্যাকেটের ভেতর-বাইরে দুই রকম সংলাপ একইসঙ্গে পড়ে গেলে পাব তৃতীয় একটি গল্প।

এ ধরনের গল্প লেখা সম্ভব কিনা জানি না, এটুকু জানি মানুষ যা কল্পনা করে তার বাস্তব রূপ অবশ্যই সম্ভব—বর্তমানে না হোক ভবিষ্যতে কখনো; এবং এ রকম একটি গল্প লিখে ফেলতে পারলে আর কিছু না হোক সংলাপের মতো জরুরী একটি বিষয় সম্পর্কে আমার ধারণা আরো আগেই কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারত। বলাবাহুল্য, আমার অনেক ইচ্ছার মতোই এই বিশেষ গল্পটি লিখে ফেলার ইচ্ছাও বহু কাপ কফির তলায় আশাহীনভাবে ডুবে গেছে।

আবার এক সময়ে ভেবেছিলাম, এমন একটি লেখা লিখব যেখানে কোন্ সংলাপ কে বলছে সেটা জানা জরুরী নয়, সংলাপের বক্তব্যটুকুই আসল বস্তু, অতএব সংলাপের আগে বা পরে বক্তার কোনো নির্দেশ থাকবে না। এই পরীক্ষাটি বাস্তবেই করেছিলাম 'জেসমিন রোড' নামে আমার এক উপন্যাসে। সিকান্দার আবু জাফর তখন বেঁচে ছিলেন, তাঁর কাছে পরীক্ষাটির কথা বলবার পর তিনি 'সমকাল'-এ প্রকাশের জন্যে আমন্ত্রণ জানান; এবং পরের মাস থেকেই 'সমকাল'-এ 'জেসমিন রোড'-এর খণ্ড প্রকাশিত হতে থাকে; কিন্তু মাত্র দুই কি তিন সংখ্যা লেখার পর আমি অনুভব করি যে এভাবে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে, অন্তত তখন সম্ভব হচ্ছে না। লেখা বন্ধ করে দিই, জাফর ভাইয়ের বহু অনুরোধ সত্বেও যখন আর পরের কিস্তি দাখিল করি না, তখন, তিনি 'সমকাল'-এর পাতায় লেখক হিসেবে আমার মৃত্যুর যে ঘোষণা কালো বর্ডার দিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা পুরনো পাঠকদের কারো কারো এখনো মনে আছে বলে আমার ধারণা।

বছর দশেক পরে সেই 'জেসমিন রোড'ই আবার আমি নতুন করে লিখতে বসি 'দুঃসহবাস' নামে। তখন কিন্তু পুরনো পরীক্ষাটি আর করিনি। সংলাপ কে বলছে না বলছে তার পতাকা বিশ্বস্তভাবেই পুঁতে গেছি 'দুঃসহবাস'-এ। তবে, এখনো আমার ইচ্ছে আছে, ভবিষ্যতে অন্তত একটি লেখা লিখব যেখানে সংলাপ কে বলছে তার কোনো নির্দেশ থাকবে না। আমার মনে হয়, এখনকার বাংলাদেশে অভিজ্ঞতার এমন একটা পর্যায়ে আমরা আছি যখন বক্তার চেয়ে বক্তব্যই একজন ঔপন্যাসিকের কাছে বেশি ব্যবহারযোগ্য মনে হতে পারে; কারণ,আমরা কি দেখিনি, আমরা কি দেখছি না?—যে, আমাদের মাথার ওপরে এবং আমাদের চোখের সমান্তরালে এমন মানুষের সংখ্যাই বাড়ছে যারা নিতান্তই সংখ্যাবাচক; তাঁদের নাম ভিন্ন হলেও উক্তি, পোশাক এবং কৌশল অবিকল এক।

১৯. সংলাপ সতর্কতা

নাটক তো সংলাপ ছাড়া নয়; গল্প উপন্যাসও কি তাই? আমার মনে হয়, আমরা ধরেই নিয়েছি মানুষ যেমন সমাজে বাস করলে গায়ে পিরান দেবে, কিছু না জুটুক এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া তাকে পরতেই হবে, তেমনি গল্প লিখতে বসে চরিত্রের মুখে কিছু না হোক

দুটো সংলাপ দিতেই হবে লেখককে, এ নিয়ে যেন প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই।

আর আমার সন্দেহ, লেখকেরাও সংলাপ নিয়ে, সংলাপ থাকবে কি থাকবে না, থাকলে কতটুকু থাকবে, গল্পের ঠিক কোন অংশটুকু সংলাপে দেয়া দরকার এ নিয়ে সচেতনভাবে কিছু ভাবেন না। সংলাপ যেন কলমের টানেই চলে আসে। বাংলা ভাষায় লেখা অধিকাংশ গল্প উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয়, লেখকেরা সংলাপ ব্যবহার করেন মুহূর্তের প্রেরণায়, হয়ত বা বর্ণনার এক ঘেঁয়েমি দূর করবার জন্যে, অথবা, এমন কঠিন সন্দেহ করাও কখনো কখনো অমূলক নয় যে, লেখক সংলাপ দিচ্ছেন লেখাটির দৈর্ঘ্য বাড়াবার জন্যে।

অথচ আমরা এই বাংলা ভাষারই শ্রেষ্ঠ একজন গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ তো না লক্ষ করে পারি না। তিনি তাঁর 'একরাত্রি' গল্পটিতে একটিও সংলাপ লেখেননি, আবার 'ছুটি' গল্পের শুরু এবং শেষভাগে কেবল সংলাপ লিখেছেন, আবার 'অতিথি' গল্পে পরিষ্কার রাতে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সংলাপ ছিটিয়ে দিয়েছেন কাহিনীর চৌদ্দ আনা জুড়ে, তারপর হঠাৎ যেমন এক খণ্ড কালো মেঘ দিগন্তের এক কোণ ছেয়ে ফেলে তেমনি তিনি এ গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন বর্ণনা দিয়ে এবং সে বর্ণনার বাক্যগুলো দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ, জটিল এবং তামসি করতালিপূর্ণ। আমরা আরো না লক্ষ করে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের গল্পগুলোতে কমিয়ে আনছেন বর্ণনা, সংলাপের ভাগ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এবং তাঁর পক্ষে শুধু সংলাপ অবলম্বন করে 'শেষের রাত্রি'র গল্প লেখা সম্ভব হচ্ছে। কেবল তাই নয়, তিনি গল্পগুচ্ছেই 'কর্মফল'-এর মতো রচনা গ্রন্থিত করতে ইতস্তত করেননি, যে গল্প ষোলো আনা সংলাপ নির্ভর কিন্তু নাটক নয়; কিংবা এখনকার তরুনেরা বাইরের রূপ দেখে মিনি চিত্রনাট্য বলতেও লুব্ধ হবেন; রবীন্দ্রনাথ 'কর্মফল'কে ছোট গল্পই বলেছেন, অন্তত তাঁর গদ্য নাটকের তালিকায় এই লেখাটিকে তিনি জায়গা দেননি।

আর কাউকে না হোক রবীন্দ্রনাথকে সমুখে রাখলেই আমরা বুঝতে পারব সংলাপ একটি গল্পকে এগিয়ে যেতে, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবিষ্ট হতে, কিভাবে সাহায্য করে। অথবা, হাতের কাছে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' থাকলে, শুধু এই একটি বই আরো একবার সতর্কভাবে পড়লে, আমরা অনুভব করতে পারব তিনি, মানিক, কতখানি প্রতিভা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে।

আমার বহুদিনের সন্দেহ, আমাদের লেখকেরা সবচেয়ে উদাসীন সংলাপের বিষয়ে, কিংবা তাঁরা ধরেই নে, কলম এনে দেবে সংলাপ যখন যেখানে দরকার—এ নিয়ে আগেভাগে ভেবে রাখবার দরকার নেই। তাই আমরা দেখি, যেখানে সংলাপ দরকার নেই, যেখানে সংলাপ আমাদের নতুন কোনো তথ্য দিচ্ছে না, নতুন কোনো কোনো থেকে আলো ফেলছে না, সেখানে বন্যার মতো সংলাপ, আর ঠিক যে জায়গাটিতে প্রয়োজন ছিল সংলাপের লেখক সেখানে বর্ণনার কাঁধে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করছেন।

বাংলা ভাষায় গত বিশ বছরে যত গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার ভেতর থেকে আপনি কি নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে পারেন না পথে হঠাৎ দেখা হবার পর সংলাপ?—চা খাবার আমন্ত্রণ?—কুশল জিজ্ঞাসা? এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায় যাবার অন্তবর্তী কাল হরণের জন্যে যাবতীয় কথাবার্তা?—তরুণ তরুণী বা দম্পতির রাগ অথবা বিরাগের বিরামহীন উদ্বারণ?

আমার ধারণা- সম্ভব, খুবই সম্ভব ; এবং আমরা দেখবো এই জাতীয় লক্ষহীন সংলাপ আমাদের লেখা কতখানি জুড়ে আছে। বস্তুত পক্ষে এমন লেখার সন্ধান পাওয়াও কঠিন হবে না মোটেই, যেখানে অর্থহীন, কারণহীন, পৃষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধিকর সংলাপই লেখা হয়েছে ক্লান্তিহীন কলমে।

মনে পড়ছে, এখন প্রয়াত আমাদের অগ্রজ একজন লেখকের কথা ; পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি তাঁর এক বড় গল্পে এক তরুণ এবং তাঁর প্রেমিককে নিয়ালাম বসিয়ে এই রকম এক সংলাপ-শ্রেণী রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই গল্পে মেয়েটি— মিলি— কথা বলতে চাইছে না, ছেলেটি তাকে দিয়ে কথা বলাবেই— স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি—

'মিলিয়া—মিলিয়া।'

—মিলি চুপ।

'মিলি—মিলি।'

'চুপ।

'মিলি।'

—সাড়া নেই।

'মি।'

—সাড়া নেই।

'মি – মি – মি।'

—সাড়া নেই।

'মি ই ই ই ই।'

এরপর লেখক যে সংলাপটি মিলির মুখে বলিয়েছিলেন সেটি কম্পোজ করাবার জন্যে তাঁকে ছাপাখানায় কম্পোজিটরের পাশে বসতে হয়ে ছিল। ছেলেটির এক নাগাড়ে ডাক শুনে শুনে মিলি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল—ুঁ—ওপরে চন্দ্রবিন্দু, নিচে হ্রস্ব উ—অর্থাৎ প্রায় শোনা যায় না এমন একটি অনুনাসিক উচ্চারণ।

এই লেখাটি আমাকে বলেছিলেন, 'উপন্যাসের দৈর্ঘ বাড়াবার জন্যেই ওরকম সংলাপ—শ্রেণী আমি রচনা করেছিলাম, আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আমার ছিলো না।'

এ থেকেই বোঝা যাবে, লেখার দৈর্ঘ বাড়বার জন্যে একজন লেখক কতদূত পর্যন্ত যেতে পারেন।

আসলে, গল্প আমরা লিখি বাহ্যিক দুটি উপাদান হাতে নিয়ে ; এক—বর্ণনা—বাইরের এবং করোটির ভেতরের, দুই—সংলাপ। এই উপাদানগুলো ঠিক মাত্রায় মেশাতে না পারলে গল্প কসনোই সম্ভবে/পৌঁছুবে না ; এই উপাদানগুলোর মাত্রা ঠিক করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, গল্পের ব্যক্তিত্বটি বুঝে নেয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সংলাপবিহীন 'ক্ষুধিত পাষান'—এর পাশে একেবারে সংলাপ নির্ভর 'শেষের রাত্রি' গল্পটি মিলিয়ে দেখলেই আমাদের বুঝে নিতে দেরী হয় না, যে, একেকটি গল্পের ব্যক্তিত্ব কিভাবে একজন লেখককে বলে দেয় 'বর্ণনা ও সংলাপ' এই দুয়ের পরিমানটি ঠিক কেমন হবে।

২০. বিষয়ের চেয়ে গদ্যকে বড় করে দেখা

তাঁর গল্প বা উপন্যাস সম্পর্কে কথা উঠলেই— সমসাময়িক একজন লেখকের কথা আমি এখন মনে করছি— তাঁর গদ্যের প্রশংসা অকুণ্ঠ সকলে করে থাকেন। বছরের পর বছর, আড্ডা থেকে আড্ডায়, ভোজসভা থেকে ভোজসভায় ঘড়ির ঘন্টাধ্বনির মতো অনিবার্য এই উচ্চারণ আমি শুনেছি- 'তাঁর গদ্যটি চমৎকার'। প্রতিবার আমি আশা করেছি তাঁর লেখা সম্পর্কে কোনো মত কোনো মন্তব্য এবার হয়তো পাবো, প্রতিবারই আমি হতাশ হয়েছি। তাঁর গদ্য এবং একমাত্র গদ্যের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই আমার কানে পশেনি। যেন আমাদের এই লেখক কখনোই কোনো গল্প লেখেননি কিংবা উপন্যাস; যেন তাঁর হাতে তৈরী হয়নি কোনো স্মরণীয় চরিত্র, উদ্‌ঘাটিত হয়নি মানুষের কোনো উত্তাপ অথবা শৈত্য। আমি এখন প্রয়াত এক নাট্যকারের কথাও মনে করছি যাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা বিস্ময় এবং ঈর্ষার অনুভব ছাড়া স্মরণ করতে আমরা অক্ষম। আমরা স্মরণ করি, উল্লেখ করি এবং আর কখনো দেখতে পাবো না বলে আক্ষেপ করি— তাঁর উপস্থিত বাক্য গঠনের চাতুর্য, শব্দ-সংগ্রহের ক্ষিপ্রতা, স্বরপ্রক্ষেপের চারু নাটকীয়তা। কিন্তু একবারও কি দৃষ্টিপাত করি তাঁর বক্তব্যের দিকে?

গদ্য তো এমন কোনো কুসুম নয় আকাশে যার চাষ! গদ্য কিংবা পদ্য, বস্তুত ভাষা ব্যবহার, কি সাহিত্যে কি সংসারে, কৃষিকাজের অবিকল একটি উদ্যোগ। ধান, সরষে কিংবা গোলাপের মতোই; বিশেষভাবে নির্বাচিত, অর্জিত, কর্ষিত একটি ভূমিখণ্ডে তার বপন ও ফলন।

তাহলে? তাহলে আমরা যখন বলি 'তাঁর গদ্যটি চমৎকার' এবং তাঁর বিষয়, প্রস্তাব, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলবার মতো কিছুই আর খুঁজে পাই না, তখন কি এমন এক অট্টালিকার সমুখে আমরা দাঁড়িয়ে নেই যার পলেস্তারা আছে দেয়াল নেই, কার্নিশ আছে ছাদ নেই? —অথবা আকাশে এমন একটি মুখ আমরা কি লক্ষ করতে চাইছি না আসলে যা শরৎকালের শাদা মেঘ? এমনটা কি হতে পারে?— আসলে এই লেখকেরই নতুন কিছু বলবার নেই; আমরা বন্ধু বা সহৃদয় বলেই তাঁর এ অভাবের দিক গোপন করে যতটুকু তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ তাঁর গদ্য, তারই উল্লেখ ক্লান্তিহীন করে চলেছি? সত্য যদি এই হয়, তাহলে আরো সত্য -সময় কিন্তু আমাদের মতো সহৃদয় নয়।

আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করি তখন কি প্রথমেই বলি, এবং এটুকু বলেই কি বিদায় নিই যে, 'তাঁর ছন্দ চমৎকার'?

আমরা যখন পিকাসোর ছবির সমুখে দাঁড়াই, তাঁর রঙের ব্যবহারটুকুই কি আমাদের প্রথম এবং একমাত্র চোখে পড়ে?

পল রোবসনের গান শুনে কেবল তাঁর সরগমের দক্ষতাটুকু?

রবীন্দ্রনাথ কি ছন্দের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ? পিকাসো পিকাসো হন রঙ ব্যবহারের চাতুর্যেই কেবল? শুধু গায়কির জন্যেই একজন রোবসন? প্রম্পট করবার দরকার আছে কি যে এর সবগুলোর উত্তর— নির্মম সংক্ষিপ্ত একটি 'না'?

'তাঁর গদ্য চমৎকার'— শুনে আমার মনে হয়, একটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার পর যখন জিগ্যেস করা হলো 'লোকটি কেমন?' উত্তর হলো 'তাঁর স্বাস্থ্যটি ঈর্ষণীয়'। জানা

গেল না সে উন্মাদ কি সুস্থ, তার মূল্যবোধ আছে কি নেই, সিদ্ধান্ত করতে পারা গেল না তার সখ্য কাম্য কিংবা নয়।
অথচ ঠিক এই ব্যাপারটিই আমরা করে চলেছি; ঠিক এই ফাঁকটিকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি যখনি এই বিশেষ লেখকটির কথা উঠে পড়ছে। যদি, ধরে নেয়া যাক যদি, তাঁর গদ্য এতই চটপটে ঝলমলে গনগনে যে তাঁর লেখা পড়ে প্রথমেই আক্রান্ত হতে হয় ঐ গদ্যের হাতে, আমি বলব— চাই না সে গদ্য; আমি বলব— স্বয়ং লেখকেরই জন্মশত্রু ঐ গদ্য। এবং বন্ধু হিসেবে, তাঁকে বলব –সতর্ক হোন।
কারণ, গদ্য তো বাহন মাত্র; পাল্‌কীর জেল্লাদার নকশায় আরোহিণীর রূপই ম্লান হয়ে যাচ্ছে যে ! কখনো কখনো তাকে তো চোখেই পড়ছে না। উপমাটিকে আরো খানিকটা খাটিয়ে নিতে পারি। বলতে পারি— কেবল নকশাই নয়, বাহনটির বিশেষ নির্মাণ সম্পর্কেও ভাবতে হবে। জলে পাল্‌কী চলে না, অতএব যমুনা পাড়ি দিতে পাল্‌কীর ফরমাস করাটা প্রতিভা নয় বাতুলতারই প্ররোচনা বলে ধরে নেবো। খাড়া পাহাড়ে উঠতে চাই ভিন্ন কোনো বাহন; সমুদ্রের গভীরে নামতে অন্য কোনো যান, নইলে নামব হয়ত ঠিকই কিন্তু জলের কবরে।
উপমান ও উপমেয়র সীমাবদ্ধতা আছে, অতএব এখানেই থামতে হলো। এতক্ষণে আমার বলবার কথাটিও শীত-গ্রীষ্ম সইবার মতো স্বাস্থ্য পেয়ে গেছে যে—
গদ্যের জৌলুশ বিড়ম্বনা মাত্র;
উক্তির আসন গদ্যের ওপরে;
উক্তির ফাঁক গদ্য দিয়ে পূরণ করা যায় না— গদ্যের দুর্বলতাও উক্তির সালসায় কখনোই কাটে না;
উপলব্ধির হাত ধরে আসে গদ্য;
বিষয় এবং প্রস্তাব অনুসারে গদ্যের চাল পালটায়;
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন আনে তাঁর গদ্যের বিবর্তন;
যে লেখকের গদ্যের প্রশংসাই কেবল করি, বস্তুত তাঁর নিন্দাই আমরা করে যাই—
আমাদের উচ্চারণ তাঁর ব্যর্থতাকেই সনাক্ত করে।

২১. গদ্যের জাদু কোথায়

'চমৎকার গদ্য'— সংক্ষিপ্ত এবং প্রতারক এই প্রশংসা বাক্যটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনিশ শো চুয়ান্ন সালে। ও বছর আমার গল্পের প্রথম বই 'তাস' বেরুবার পর একাধিক বন্ধু বলেন— 'সৈয়দ হক চমৎকার গদ্য লেখে'। শুনে খুশি হইনি বললে মিথ্যে বলা হবে; তবে একই সঙ্গে সত্য এই যে, তখনই আমার মনের ভেতরে সন্দেহের একটা ছোট্ট কুশও অনুভব করেছি।
চমৎকার গদ্য? শেলফ থেকে একটা বই নেয়া যাক। মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'জীবন আমার বোন'। যে কোনো একটি জায়গা বের করি; সাতচল্লিশের পাতা; পড়ে দেখি।
'হীরের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো নীলাভাবী। খোকা হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলাভাবীর দু'চোখ দিয়ে। মাঝখানে দুটি বিন্দুর মতো দু'জনকে বসিয়ে অকারণ আনন্দে চারটি দেয়াল যেন হাত ধরাধরি করে শিশুর মতো নেচে নেচে ঘুরপাক খাচ্ছে; দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান। লেসের কাজে মোড়া টিপয়ের ছাউনি দুলছে., দুলছে ফুলদানি, দুলছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রজনীগন্ধাগুচ্ছ, ট্রানজিস্টার যেন বনবিড়াল, খাড়া করে মৃদু মৃদু নাড়ছে এরিয়েল-লেজ; হাওয়া, এত হাওয়া আসে কোথা থেকে, সমুদ্রের খুব কাছে তারা, কিংবা একটা জাহাজের ভিতর হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে।'
বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে কাণ্ডজ্ঞানহীন বহু মত ও মন্তব্যের অহরহ উৎপাত থাকলেও, এবং কারো সঙ্গে কারোরই কখনো ঐক্যমতের সাধারণ কোনো ক্ষেত্র— এমনকি সংকীর্ণতম কোনো ক্ষেত্র লক্ষ করা না গেলেও, এই একটি মন্তব্য প্রায় নিষ্কন্টক যে, 'মাহমুদুল হক চমৎকার গদ্য লেখেন।'
তাঁর সেই চমৎকারিত্ব তাহলে কোথায়?
ওপরে তুলে দেয়া অনুচ্ছেদটি আমি আবার পড়লাম। পাকা হাত; কিন্তু শিল্পটুকু কোনখানে? আরো একবার পড়ে দেখিনা কেন?
এবার চোখে পড়ছে জ্যামিতিক একটি বিন্যাস। অনুচ্ছেদটিতে মোট পাঁচটি বাক্য। প্রথম তিনটি বাক্য প্রায় এক মাপের, চতুর্থ বাক্যটি প্রথম তিনটি বাক্যের যোগফলের প্রায় সমান জায়গা নিচ্ছে, আর পঞ্চম বাক্যটি দ্বিগুন জায়গা নিচ্ছে চতুর্থ বাক্যটির। যেন চোখে দেখতে পেলাম— তিনটি এক মাপের সরল রেখা একের নিচে আর, তার নিচে দীর্ঘতর একটি রেখা, আর সবশেষে দীর্ঘতম রেখাটি।
এই বিন্যাস, এই পরিকল্পনা, চমৎকারিত্ব কি এখানেই?
অথবা, মনে মনে নয়, উচ্চারণ করে পড়বার সময় দেখছি প্রথম তিনটি বাক্য অকম্পিত। চতুর্থ বাক্যের শেষ অংশে 'দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান' বলতে গিয়ে এই প্রথম মৃদু একটি দোল।
তারপর, পঞ্চম বাক্যে এসে অনবরত দোল, ছোট ছোট দোল; সবশেষে 'হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে' আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল স্থির কিনারায়। স্থির, কিন্তু এখনো কি আমরা অনুভব করছি না আমাদের শ্রুতির ভেতরে সদ্য অতীত সেই দোলা? এবং রক্তের ভেতরে অভিজ্ঞতার একটি বিচ্ছুরণ?
তাই কি আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, 'তিনি কি সুন্দর গদ্য লেখেন'?
আমি এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না। তাহলে আবারো পড়ে দেখা যাক।
অনুচ্ছেদটির প্রথম তিনটি বাক্যে আছে শাদা তথ্য, মুখোমুখি দু'টি চরিত্র সম্পর্কে। এই তথ্য কোনো নাটক বা চিত্রনাট্যেও পাওয়া যেতে পারত— যা অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষেই কেবল জরুরী। কিন্তু এরপরই লেখক এমন এক সংবাদ দিচ্ছেন যার সম্ভবপরতা নিয়ে বাণিজ্যিক এলাকায় গুরুতর প্রশ্ন উঠবে; অথচ আমরা আমাদের ভেতরে তাকালেই দেখতে পাবো এ রকমটি হয়, হয়েছে, হতে পারে। লক্ষ করি, লেখক আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন আমাদেরই পরাচৈতন্যের ভেতর এবং পঞ্চম বাক্যে এসে তিনি আমাদের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা নিয়ে জাদুকরের মতো দু'হাতে লোফালুফি করছেন— তাঁর

হাতে স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজেদের সমর্পণ করেছি আমরা। এই যে তিনি আমাদের বাস্তব বল হরণ করতে পারলেন, এখানেই কি লেখকের নৈপুণ্য? —তাঁর গদ্যের চমৎকারিত্ব ? এখনো ইতঃস্তত করছি। নিশ্চিত হয়েও ঠিক আশ্বস্ত হতে পারছি না। তাহলে আরো একবার অনুসন্ধান করে দেখব?

উপমাগুলো এবার ঝকমকিয়ে উঠল। চরিত্র দুটি, দুটি বিন্দুর মতো হয়ে গেছে। ঘরের দেয়াল চারটে ব্যক্তিসত্তা পেয়ে গেছে— আবার সেই ব্যক্তিসত্তার ভেতরে এই মুহূর্তে শৈশব ফিরে এসেছে। ট্রানজিস্টার হয়ে গেছে বনবিড়াল; আর তারই জের ধরে এরিয়েল হয়ে গেছে বনবিড়ালের লেজ। সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও অনুভব করলাম— শহরের সড়ক হয়ে গেছে সমুদ্রের উপকূল, বাইরের সমস্ত শব্দ এবং কোলাহল এখন মাছের–ফিশ–ফিশানি। আর উপমা রচনার সাহস বেড়ে উঠে 'শূন্যতাবোধ' নামে সম্পূর্ণ বিমূর্ত একটি অনুভূতি পেয়ে গেছে চাঁদের উপমান— তাও ওজনহীন এক চাঁদ। এবং সেই চাঁদ সাঁতার কাটছে। কোথায় কাটছে সাঁতার? লেখক বলে না দিলেও আমরা অনুমান করে নিতে পারি চরিত্র দুটির মাঝখানে বাস্তব ব্যবধানের ভেতরে যে অন্তর্গত ব্যবধান, এখন তা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এই যে একবহর উপমা, যার অধিকাংশই লেখকের সৃষ্টি এবং কিছুটা আমাদেরও নির্মাণ, এই যে লেখকের প্ররোচনায় আমরাও ক্ষণকালের জন্যে অনুলেখক হয়ে উঠলাম, তাঁর ছুঁড়ে দেয়া বল লুফে নিয়ে আমরাও যে অন্তত একবার আকাশে তা ছুঁড়ে দিলাম— গদ্যের জাদু কি এখানেই? উপমা রচনাতেই গদ্যের চমৎকারিত্ব তাহলে?

মনে হতে পারে লেখক যখন অনুচ্ছেদটি লিখেছেন তখন এত কিছু হিসেব করে লেখেননি —সবকিছু তাঁর হাতের টানেই চলে এসেছে আর আমরা তাই নিয়ে কাটা–ছেঁড়া করছি। না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কোনো লেখক, যদি তিনি সত্যিকার অর্থে লেখক হন, তিনি সচেতনভাবেই তাঁর প্রতিটি বাক্য রচনা করেন। লেখায় কোনো কিছুই আকস্মিক নয়। আর 'হাতের টান' কথাটি তো প্রতারক যার খপ্পরে পড়ে আমরা এ রকম অন্তঃসারশূন্য উক্তি প্রায়ই করে থাকি যে, 'অমুকের গদ্য বেশ ঝরঝরে।'

২২. গদ্য আর পদ্য

'তার গদ্য চমৎকার'—বুঝে দেখা দরকার সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত কিংবা প্রেত –কে?

'গদ্য' শব্দটির অর্থ অভিধানে লিখছে– সহজ ভাষা, যে ভাষা ছন্দোবন্ধে রচিত নয়। তাহলে শামসুর রাহমান কি গদ্য লিখেছেন?— যখন পড়ছি— 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর

গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তভিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা–মাতার লাশের ওপর।'

আমি ইচ্ছে করেই শামসুর রাহমানের অভিপ্রেত লাইন–বিন্যাস উপেক্ষা করে স্তবকটি টানা তুলে দিলাম। এখানে কবিতার সাক্ষাৎ পেয়েছি, কেউ এতে দ্বিমত হবেন না; বলবেন, কবিতা, তবে ছন্দে লেখা নয়, তাই গদ্যের মতো টানা লিখে গেলেও একে আমরা কবিতাই বলব।

শামসুর রাহমানের অন্য একটি রচনা থেকে পড়ি এবং এবারেও তাঁর অভিপ্রেত লাইন বিন্যাস উপেক্ষা করে টানা তুলে দিই না কেন?

'পুড়ছে আগরবাতি, বিবাগী লোবান। ঘরে নড়ে নানা লোক; প্রবীণ নবীন ছায়া পাঁশুটে দেয়ালে। অনুরাগী কেউ আসে, কেউ যায়, দ্যাখে তার সমস্ত শরীরে উচ্চারিত মৃত্যুর অব্যয় মাতৃভাষা। আসেন সমালোচক, পেশাদার; বন্ধু কেউ কেউ, জুটে যায় বেজায় ফেরেববাজ প্রকাশক। অনুরক্ত পাঠক নোয়ায় মাথা আর বারান্দায় ভিড়ে বলপয়েন্টে ক্ষিপ্র নিচ্ছে টুকে জীবনীর ভগ্নাংশ নিপুণ নৈর্ব্যক্তিক স্টাফ রিপোর্টার। কোন সালে জন্ম তাঁর, কী কী গ্রন্থের প্রণেতা, ক'জনইবা পুষ্যি রইলো পড়ে ঘোর অবেলায়, নাকি সে অকৃতদার ইত্যাদি সংবাদ দ্রুত প্যাডে জমা হয়, তবু উন্মোচিত জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।'

ভাষা এখানে সহজ নয়, কেউ বলবেন না; তবে ছন্দে লেখা। আর সে জন্যেই, কেবল সে জন্যেই কি এই পংক্তিটি কবিতার অংশ? —যে খবরগুলো এতে পেলাম তার ভেতরে কাব্য? নাকি দু'একটি ক্রিয়াপদ ঠিক মুখের সংলাপে যেমন যে জায়গায় আসে তা আসেনি বলেই কবিতার দিকে একে ঠেলে দিচ্ছি? যেমন—'ক্ষিপ্র নিচ্ছে টুকে' লেখা হয়েছে 'ক্ষিপ্র টুকে নিচ্ছে'র বদলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি তাতেও তো ক্রিয়াপদে কবিতার এ চাল আমরা লাগাই; যেমন, দোকানিকে অনুরোধ করছি দাম কমাতে, 'করুন কিছু কম' 'কিছু কম করুন'-এর বদলে। অথবা, 'তবু উন্মোচিত জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়'—এই পর্যবেক্ষণটি শোকার্ত আলো ফেলে আগের সব তথ্যকে কবিতার অন্তর্গত করে নিল?

শামসুর রাহমানের লেখা থেকে এই যে দুটি অংশ শুনলাম, কই, শুনে তো বলে উঠলাম না, 'কি চমৎকার গদ্য' অথবা 'কি চমৎকার পদ্য' ! আমরা উদ্দীপ্ত হলাম, বিষন্ন হলাম, আশান্বিত হলাম, উত্তোলিত হলাম, আন্দোলিত হলাম, পরিবর্তিত হলাম, কত কিছুই হলাম, এবং সমস্বরে স্বীকার করলাম—এই কবির মতো এভাবে আমরা আগে দেখিনি, তাঁর চোখ দিয়ে দেখলাম, দেখে আমরা অর্জন করলাম—চোখ আর বলা যাবে না—দৃষ্টি। এই যে উদ্ধৃতি দুটি, এতেও আছে শব্দের সচেতন নির্বাচন, এতেও আছে বাক্যের নিপুণ নির্মাণ, আছে বাক্যবন্ধের সংস্থাপন থেকে উদ্ভুত দোলা, আছে উপমা, সংকেত, পর্যবেক্ষণ— ঠিক যা আমরা লক্ষ করেছি যে কোনো মহৎ উপন্যাস বা গল্পে। তবু শামসুর রাহমানের কবিতা পড়ে আমরা বলব না 'তাঁর পদ্য চমৎকার', অথচ ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়ে অন্তত একবার হলেও গদ্যের, তাঁর গদ্য লেখার শক্তির কথা আমরা স্মরণ করব।

কেন এই বিশেষ ঝোঁকটি আমরা দিয়ে থাকি কেবল গদ্যের বেলায়? বিশেষ করে গল্পে-উপন্যাসের?

আমার মনে হয়, গল্পে যেহেতু অধিকাংশ সকলে আশা করি গল্প; গল্প নিয়ে এ শতাব্দীতে বীর্যবান বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও আমরা এখনও যেহেতু জাতিস্মর অর্থাৎ প্রত্যাশা আমাদের কথকতা; যেহেতু আমরা এও বুঝে গেছি যে মানুষ কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর ধরে রীতিবদ্ধভাবে গল্প রচনা করে আসছে, কোটি কোটি গল্প লেখা হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন গল্প নির্মাণ করা আর অসম্ভব, সব সম্ভাবনাই নিঃশেষিত নির্মমভাবে, তাই আমরা গল্প লেখকের কাছে অর্ধমনস্কভাবে যা আশা করি তা 'বলবার' চাতুর্য। আমরা ভুলে যাই গল্প যিনি রচনা করেন, একটা বিশেষ কালেই করেন, বিশেষ একটা পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরবার জন্যেই তিনি রচনা করেন, এবং সেই পর্যবেক্ষণটি নতুন; তাঁর গল্প একজন কবির কবিতার মতোই আমাদের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অর্জনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের ভুলে যাবার, ভুলে থাকবার ক্ষমতা কি আসাধারণ যে, আমরা গল্পের বক্তব্য নয়, গল্পের গদ্য নিয়ে—কোনো কোনো লেখকের বেলায়—এত বেশি আলোচনা করি। আর এরই উল্টো পিঠে বহু লেখকের কথাও স্মরণ করি, করতে পারছি, যাঁরা পর্যবেক্ষণ ও বক্তব্যের তুলনায় গদ্যকে অধিকতর পরিচর্যা দিয়ে থাকেন।

এই সব লেখকেরা এবং নির্জলা গদ্যপ্রেমিক পাঠকেরা হয়ত নিচের এই অনুচ্ছেদটির সমুখে বিব্রতবোধ করবেন, একে গণনায় নেবার অনুপযুক্ত বিবেচনা করবেন হয়ত, যখন একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন—'সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না –চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল –দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেকদূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, 'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।' শৈবলিনী বলিল, 'আর কেন—এইখানেই।'

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।'

২৩. ভাষার সীমাবদ্ধতা ও লেখকের জিৎ

মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' থেকে একটা অংশ তুলে বুঝে দেখতে চেয়েছিলাম গদ্যের চমৎকারিত্ব কোথায়। সেখানে লক্ষ করেছি বাক্যগুলোর জ্যামিতিক বিন্যাস, লক্ষ করেছি সৃষ্ট ধ্বনিতরঙ্গের ধীরপদ ও দ্রুতপদ, আবিষ্কার করেছি উপমা ও চিত্রকল্পের কূটায়ুধ। গদ্যের জাদু যদি কেবল এতেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'চন্দ্রশেখর' থেকে যে অংশ এইমাত্র তুলে দিয়েছি আবার তা পড়া যাক।

আবিষ্কার করি, এই অংশটিতে উপমা নেই, চিত্রকল্প নেই, এমনকি বঙ্কিমের গদ্য বলতে আমরা যে তৎসম শব্দ, তার যে-ঝংকার, সমাসের যে-দীর্ঘ শেকল ও তার যে-ধ্বনিতাড়না আশা করতে আমরা অভ্যস্ত, আমাদের সেই আশাও এখানে মর্মান্তিকভাবে খণ্ডিত। প্রতাপ ও শৈবলিনীর উল্লেখ না থাকলে, বঙ্কিমের নাম বলে দেয়া না হলে আমরা হয়ত অনেকেই বলে উঠতাম—এ বঙ্কিমের লেখা নয়। অথচ বঙ্কিমের তো নিশ্চয়, বঙ্কিমের মতো গদ্যশিল্পীই কেবল এই অসাধ্যসাধন করতে পারেন যা এখানে করা হয়েছে।

সেটি কি?

সেটি হচ্ছে, দৃশ্যত কোনো কৌশল অবলম্বন না করবার কৌশল। অথবা এইটিই সবচেয়ে বড় কৌশল। যে বঙ্কিমচন্দ্র এর ঠিক আগেই 'ফেনচক্রমধ্যে সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল'—র মতো সর্বাংশে সাজানো একটি বাক্য লিখতে পারেন, তিনিই যখন—ভঙ্গী ধার করে বলি—অকস্মাৎ জলদমুক্ত পূর্ণশশীর মতো বেরিয়ে এসে উপন্যাসের দুরূহতম মুহূর্তটি সবচেয়ে সরল কলমে লিখে যান তখন তাঁরই একটি উপমা যা 'চন্দ্রশেখর'-এর শেষ পৃষ্ঠায় আছে ব্যবহার করে বলি, আমরা এক 'অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু' প্রত্যক্ষ করবার মহাবিস্ময় অনুভব না করে পারি না।

অথচ সত্যিই কি এখানে তাঁর কলম সবচেয়ে সরল?

আমার মনে পড়ছে আমারই মেয়ে বিদিতার কথা। তখন বছর সাত বয়স তার। একদিন এসে বলল, 'বাবা, তোমার ঘরের এই দেয়াল শাদা তো? আমি এক্ষুণি এই দেয়াল সবুজ করে দিতে পারি।' আমি তো ভেবেই পাই না কি করে শাদা দেয়াল চোখের পলকে সবুজ হয়ে যাবে। অপেক্ষা করি। বিদিতা চট করে স্বচ্ছ একটা সবুজ কাগজ আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'এইবার দ্যাখো তো সবুজ কিনা?' অস্বীকার করবার কোনো উপায় থাকে না আমার। সে চলে যাবার পরও বিস্ময় কাটে না যে, যেখানে দেয়ালের কথাই ভাবছি সেখানে নিজের চোখদুটিতেই কাগজে পরিয়ে বিভ্রমটা কত সহজে সৃষ্টি করা গেল।

আক্ষরিক অর্থে জাদু চোখের ব্যাপার; শিল্পের জাদু মনের ভেতরে। বঙ্কিমের লেখা অংশটির দিকে আবার তাকানো যাক।

এবার কি আমাদের চোখে পড়ছে না?—প্রতিদিনের ব্যবহার, বহু ব্যবহারে মলিন ও ক্ষীণপ্রাণ অতিপরিচিত শব্দগুলোকে তিনি কি প্রখর উজ্জ্বলতা ও সাংকেতিকতা দিয়েছেন? আমরা কি লক্ষ করতে পারছি না?-শব্দগুলো কি উৎসাহের সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ-সম্ভাবনার চূড়ান্ত বলয়সীমা অতিক্রম অথবা সেই বলয় সীমাকেই কিভাবে বিস্তৃত করে চলেছে? যেমন, 'তিরস্কার করিল' এবং তারপরেই 'গালি দিল'— তিরস্কার ও গালি সমার্থক হলেও ব্যবহারগুণে এ ক্ষেত্রে অর্থভেদ ঘটে যাচ্ছে। বাক্যটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি, তীরের লোকেরা প্রথমে শৈবলিনী ও প্রতাপকে শিষ্ট ও ভদ্রভাষায় ফিরতে বলছে; তাতে তারা কান দিল না দেখেই, আমরা পরিস্কার শুনতে পাই, লোকেরা এখন মুখে যা আসছে তাই বলে তাদের ফেরাতে চাইছে; এবার আর তাদের ভাষা বা ভদ্রতার কোনো বালাই নেই। অলিখিত সংলাপের এই দুটি স্তরের সংকেত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন সমার্থক দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে।

কেবল শব্দই নয়, দুই শব্দের মাঝখানে যে ফাঁক, উচ্চারণকালে যে যতি, তাও কি অক্ষরে রচিত কোনো শব্দের চেয়ে কম অর্থপূর্ণ? যেমন, 'তাহারা শুনিল না' আর 'চলিল' এই দু'য়ের মাঝখানে যে যতি তা কি আমাদের মনের ভেতরে প্রতাপ ও শৈবলিনীর ক্ষণকালের জন্যে থেমে পড়া এবং পরমুহূর্তে আবার এগিয়ে যাওয়ার ছবিটি এঁকে দিয়ে গেল না? আমরা কি তাদের মুখ, সেই মুখের অভিব্যক্তিটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম না? অথবা, যেখানে লেখা হয়েছে 'শৈবলিনী ডুবিল না' তারপরে এই বাক্যটি যে 'সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল'– এই দুটি বাক্যের মাঝখানে একটি মানুষের জীবন–মৃত্যু ছোঁয়া কোনো সিদ্ধান্ত— যে সিদ্ধান্ত একটি মহাযুদ্ধ শুরু করবার তুলনায় কম গুরুতর নয়; অথবা ব্যক্তিগত বলেই আরো অসহায়, ফলত আরো নিঃসঙ্গ এবং বলবিযুক্ত এই সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত নেবার মহামুহূর্তটি রুদ্ধশ্বাস হয়ে কি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম না? বঙ্কিম উপন্যাসের এই সংকট–মুহূর্তটি নির্মাণ করেছেন উপমা–তুলনা–চিত্রকল্প বর্জন করে সম্পূর্ণ নগ্ন শব্দের সংকেতের সাহায্যে। এই সংকেত যেন চিত্রকরের রেখাঙ্কনের মতো—একটি মুখ সম্পূর্ণ আঁকা হয়নি; কেবল চোখ, চিবুকের একটু আভাস, চুলের একটা ঢেউ—যখন দেখলাম মুখটি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করলাম, এমনকি তার মন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সংকেত প্রয়োগে যে কতখানি সফল তা অনুভব করি যখন শেষ দুটি বাক্য পড়ি। 'শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।' প্রথমে মনে হতে পারে শেষ বাক্যটি আগের বাক্যের শেষ শব্দটির সম্প্রসারণমাত্র, মনে হতে পারে দ্বিরুক্তিদোষ ঘটেছে। কিন্তু না, একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পাবো, শেষ এই বাক্যটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে শৈবলিনীর জন্মান্তর ঘটে গেছে; আমরা জানতে পারছি, সাঁতার দিয়ে এখন যে ফিরে এলো সে শৈবলিনীর পা জলে নয়, স্থলে—সংসারের কঠিন মাটিতে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস উপন্যাসই হতো না যদি না শৈবলিনী এই সিদ্ধান্তটি নিত—নদীতে শেষ পর্যন্ত ডুবে না মরার সিদ্ধান্ত। উপন্যাসের এই দুরূহতম দৃশ্যটি লিখতে গিয়ে বঙ্কিম অবশ্যই অনুভব করেছেন—লেখক বলেই আমি প্রতীতির সঙ্গে বলতে পারছি যে—ভাষার আছে সীমাবদ্ধতা। ভাষায় কখনোই আমরা সম্পূর্ণ করে কিছু বলতে পারি না। বড়জোর বক্তব্যের দিকে পাঠক বা শ্রোতাকে টেনে আনতে পারি এবং হয়ত তাকেও এক অর্থে রচয়িতা করে তুলতে পারি; যিনি তা সাবলীলভাবে পারেন তিনি লেখক; যিনি তা জীবনের অনুকূলে পারেন তিনি মহৎ লেখক; আর যিনি পুরুষের পর পুরুষ এই কীর্তিটি সাধন করতে পারেন তিনি অমর লেখক॥

গ | ল্পে | র | ক | ল | ক | ব্জা

রবীন্দ্রনাথের *পোস্টমাস্টার*

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি কোনো ছোট গল্প নেবো এবং এর ভেতরের কলকব্জা দেখব। সব কিছুর মতো গল্প লেখাও শিখতে হয় এবং আর অনেক কিছুর মতোই এ শেখার জন্যেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভালো শিক্ষক বাংলা ভাষায় আর নেই।
এখন আমরা তাঁর খুব চেনা একটি গল্প হাতে নিয়েছি—পোস্টমাস্টার। এবং পড়ছি। গল্পটি শুরু হল এভাবে—'প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়।' এর পর একটি ছোট এবং একটি দীর্ঘ বাক্য রচনা করে গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তার আগে প্রথম এই বাক্যটির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক ভালো করে। এই বাক্যে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছি গল্পের নামচরিত্র সম্পর্কে যে, এই তার প্রথম চাকরি, অর্থাৎ এতকাল তার জীবনের যে ছন্দ, লয় ও পটভূমি ছিল তা থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসে অপরীক্ষিত, অনাবিষ্কৃত একটি ক্ষেত্রে সে পা রেখেছে। ভালো। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলেশহীন বড় সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন—'গ্রামটি অতি সামান্য।' আমাদের মনে, এবং পোস্টমাস্টারের মনেও যদিবা কোনো সুখ বিলাস প্রত্যাশা জেগে উঠে থাকে এই উলাপুর গ্রাম এবং এই গ্রামে তার আসা নিয়ে, এই একটি বাক্যে তা খণ্ডিত, দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। মনেই হতে পারে, আমাদের কৌতূহলকে খুঁচিয়ে চাঙ্গা করবার জন্যে, একটি কোলাহল সৃষ্টি করবার লক্ষ্যেই বুঝিবা, রবীন্দ্রনাথ এর পরের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, 'নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নতুন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।'
—এই জন্যে মনে হতে পারে, যে, এখানে কুঠি, সাহেব, পোস্ট-আপিস স্থাপন এই জাতীয় বীর্যবান যাবতীয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু না। আমরা গল্পের ভেতরে আর কিছুদূর প্রবেশ করলেই, মাত্র এক অনুচ্ছেদ পরে, দেখতে পাবো, এই বাক্যের আঘাতে যে কর্মচঞ্চল গুঞ্জন রচিত হয়েছে তা পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গতাকে অধিকতর আশাহীন বন্ধুহীন করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শুরুতেই এভাবে, মাত্র তিনটি বাক্যে, সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদে, গল্পের বীজই নিপুণভাবে রোপন করে দিলেন। তিনটি বাক্য আলাদাভাবে আমাদের কিছু বলে না, কিন্তু একের পরে আর যখন উচ্চারিত হয়, তখন আমাদের উৎকণ্ঠিত ও কৌতূহলী করে তোলে; উৎকণ্ঠিত, কারণ আমরা শুনেছি 'গ্রামটি অতি সামান্য।'
আমি বলেছি, একটু আগে, 'রবীন্দ্রনাথ পরের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন।'—'উচ্চারণ' শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছি। এবার পরের অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যটি লক্ষ্য

করুন—'আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে।' আমাদের? আমাদের পোস্টমাস্টার? রবীন্দ্রনাথ তো শুধু লিখতে পারতেন 'পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে', 'আমাদের' কেন জুড়ে দিলেন? কেন স্থাপন করলেন এই আত্মীয়তা? এবং যদি এই আত্মীয়তাই তিনি স্থাপন করলেন, তবে সারা গল্পের আর কোথাও কেন, এমন কি পোস্টমাস্টারের ঘোর অসুখের সময়েও, তার প্রকাশ আর দেখা গেল না? আমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করি এবং বাক্যটি আরেকবার উচ্চারণ করি, 'আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে'; আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করবার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিবেশ ও ভঙ্গী রচনা করলেন। তিনি এমন একটি আবহ তৈরী করলেন, যেন, এই গল্প এখন ঘটছে না, অতীতে ঘটে গেছে এবং এই ঘটনা খুব ঘনিষ্টভাবে জানেন এমন একজন কোনো এক বৈঠকে শ্রোতাদের শোনাচ্ছেন। সম্ভবত মানুষের বারবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে আবার একই ভুল করবার বিষয়ে সেখানে আলাপ উঠেছিল, তখন এরই একটি উদাহরণ হিসেবে, একজন যিনি উলাপুর গ্রামে এক পোস্টমাস্টার ও তার পরিচারিকা বালিকাকে দেখেছিলেন তার কথা বলেন এবং তার কথাটিই যেন কলমের মুখে লিখে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা গল্প শেষ করে আবিষ্কার করতে পারব, যে, এই কথক ভদ্রলোকটি উলাপুর গ্রামেরই, অথবা তিনি বাইরের যদি হন, পোস্টমাস্টার উলাপুর ছেড়ে চলে যাবার পরও সেখানে ছিলেন, তাই তিনি 'আমাদের' পোস্টমাস্টার চলে যাবার পর পরিচারিকা বালিকাটিকে লক্ষ করতে পেরেছেন, তিনি হয়ত লক্ষ করেছেন নতুন পোস্টমাস্টারের প্রতি একদিন কিভাবে এই বালিকা আকৃষ্ট হয়ে পরে কিভাবে আবার নতুন পোস্টমাস্টারের জন্যে জল তোলে, বাসন মাজে, রান্নার আয়োজন করে দেয় এবং তার বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে নতুন পোস্টমাস্টারের আত্মীয়স্বজনকে সে আবার নিজের আত্মীয়জ্ঞানে সম্বোধন করতে থাকে। এর সবটাই যে আমাদের কথক ভদ্রলোকটি দেখেছেন, দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিটি কথোপকথন শুনেছেন, তা নয়; তবে তিনি সংসারঅভিজ্ঞ ব্যক্তি, সবটুকু তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হয় না, স্বকর্ণে শুনতে হয় না, বাকিটুকু তিনি অভিজ্ঞতা ও জীবন-জ্ঞান দিয়ে অনুমান করে নিতে পারেন। তিনি জানেন, জীবন থেমে থাকে না; জীবন পেছন ফিরে চায় না। এটা রবীন্দ্রনাথও জানেন, এ গল্পে এটাই তাঁর জানাবার কথা আমাদের, তাই লেখক-রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে গল্পের শেষে নিজে লিখতে পারতেন -প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিলেন 'রতন', রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্যে অপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ সত্য হলেও বড় নিষ্ঠুর সত্য এবং সেই নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করা হতো নিষ্করুণভাবে এবং শিল্প তাতে কতটা থাকত, সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী শিল্প সৃষ্টির একটি অটুট ভঙ্গী এই যে, তিনি নিষ্করুণভাবে কিছুই কখনো উচ্চারণ করেননি, তিনি কঠিন সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মায়ের মতো মমতায় এবং বিস্ময়কর রকমে শিল্প সচেতনভাবে। তাই 'পোস্টমাস্টার' গল্পে জীবনের একটি বিশেষ সত্য প্রকাশের জন্যে তিনি রচনা করেছেন এই ভঙ্গী—যেন তিনি নন, অন্য কেউ ঘটনাটি দেখেছে; শিল্পের কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন স্বচ্ছ একটি মুখোশ, যেন তিনি নন, অন্য কেউ আমাদের গল্পটি বলছে।

অতএব, 'পোস্টমাস্টার' গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম একটি কোণে এবং বিশেষ একটি

দূরত্ব নিজেকে স্থাপিত করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই যে স্বচ্ছ মুখোশ পরা নতুন এক ভদ্রলোক তিনি সাজলেন, এই শিল্প-বিভ্রমটি নিশ্ছিদ্র করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অতঃপর যে বাক্যগুলো রচনা করতে লাগলেন, ক্রিয়াপদের যে রূপ তিনি ব্যবহার করতে শুরু করলেন, তাতে পরতে পরতে এই ছবিটিই স্পষ্ট হতে থাকল যে, আমরা এক ভদ্রলোকের কথা শুনছি তাঁর মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ সমেত। এই মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণের শ্রেষ্ঠ ফসল তিনি তুলবেন গল্পটি যখন শেষ করবেন, তিনি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করবেন যা অন্য কোনো উপায় কৌশল বা ভঙ্গীতে কখনোই নিখুঁত একটি গল্পের উপসংহার হতে পারত না, যা নিতান্তই সম্পাদকীয় বক্তব্যের মতো শোনাতো, ছেঁদো দার্শনিকের হতাশার মতো বোধ হতো, গল্পের সঙ্গে কিছুতেই মিশ খেতো না, ছেঁটে ফেললেই বরং গল্পের শিল্প রক্ষিত হতো; কিন্তু না,ইনি রবীন্দ্রনাথ, মমতার সঙ্গে এঁকে উচ্চারণ করতে হবে কঠিন সত্য, এবং শিল্পের শর্তে; অতএব তিনি গল্পের ভেতরেই তৈরী করে নিয়েছেন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এমন একটি চরিত্র, যিনি এই গল্পটি বলছেন, যিনি 'আমাদের' বলে পোস্টমাস্টারকে সম্বোধন করছেন; এর মুখ দিয়েই তো রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করাতে পারবেন, যা সরাসরি তাঁর পক্ষে উচ্চারণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না, যে, 'হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।' বাক্যের এই শেষাংশই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বীজকথা; কথাটি এভাবেই স্পষ্ট বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই গল্প লিখতে গিয়ে এই বিশেষ কৌশলটি তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছে—এমন একটি কথক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে যিনি পোস্টমাস্টারকে 'আমাদের' বলে দাবী করছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঐ 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করবার পরের বাক্য থেকেই বৈঠকী ঢংটি পুরো মাত্রায় প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। লক্ষ্য করুন পরের বাক্য—'জলের মাছটিকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয় এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' এখানেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ। 'জলের মাছটি' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বৈঠকের মেজাজ শুধু নয় কথকের মুখখানি পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে উঠি; সে-মুখে বেদনা-মেশানো একখণ্ড হাসি, কারণ তিনি তো পরিণতি জানেন এই কাহিনীর এবং 'দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশ'-এর সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই তিনি কেবল এই ঘটনায় নয়, এমন আরো কিছু ঘটনার পরই কেবল করতে পেরেছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ আরেক দফা খোঁচা দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে আমরা গল্পটি শুনছি বৈঠকে অথবা এক ব্যক্তির জবানীতে। তিনি লিখলেন, 'বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। সে কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা

হইয়া উঠে না।' আমরা লক্ষ্য করি, এই বাক্যটিতে মোটা দাগে কথাগুলো বলা হয়েছে, এবং 'কলিকাতার ছেলে'দের প্রতি বেশ অবিচারই করা হয়েছে। কলিকাতার সব ছেলেই নিশ্চয় এ রকম নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কলিকাতা'র ছেলে এবং থেকেছেন এক দীর্ঘকাল উলাপুরের মতো সামান্য না হলেও 'কলিকাতার তুলনায় সামান্য, অতি সামান্য শিলাইদহে; তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ মফস্বলে গিয়ে কখনো উদ্ধত বা অপ্রতিভ বোধ যে করেন নি, এ আমরা ঠাকুরবাড়ির বিষয়ে আমাদের সমস্ত খোঁজ খবর থেকে বলতে পারি; এবং এ কথাও বলতে পারি, যে, মফস্বলে গিয়ে স্বচ্ছন্দ কেবল 'কলিকাতা'র ঠাকুরবাড়ির ছেলেরাই নয়, অনেকেই বোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তবে এ রকম ঢালাও একটি মন্তব্য করলেন কেন? গল্পের জন্যেই তিনি করেছেন; পোস্টমাস্টারকে তৈরী করবার জন্যেই এ রকম কথা তাকে বলতে হয়েছে; এবং তিনি এ উক্তির ছিদ্র সম্পর্কেও ঘোর সচেতন; তাই গোড়া থেকেই তাঁকে ঘাট বাঁধতে হয়েছে। 'কলিকাতা'র ছেলেদের সম্পর্কে মন্তব্যটি বেমালুম মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না যদি আমরা ধরে নিই যে, গল্পটি বৈঠকে কোনো এক ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন। এই কথক ভদ্রলোক সম্পর্কে আমাদের সজাগ ভাবটা রাখবার জন্যে অতঃপর ক্রিয়াপদের রূপটিও দেখুন কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'অথচ হাতে অধিক কাজ নাই। কখনো কখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন।' এখান থেকে চতুর্থ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ক্রিয়াপদের রূপ এমন রাখা হয়েছে, যেন একজন কথক গল্পের ভিত্ কাটছেন। এবং এই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ টেনে গেছেন সেই পর্যন্ত যেখানে একটি বালিকা আসছে, এই প্রথম, তাঁর নাম রতন, পোস্টমাস্টারের পরিচারিকা, আসলে এই গল্পের প্রধান চরিত্র; পোস্টমাস্টারের নামাঙ্কিত হলেও এ গল্পের গাছ ফুঁড়ে বেরিয়েছে রতনের বুক চিরে। 'পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।'

গল্পের এই ভিত্ কাটবার কাজ শেষ হল রতনের উল্লেখে; সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল ক্রিয়াপদের রূপ, এতক্ষণ ছিল 'হয়ে-যায়-পায়-পারে'—এবার 'হইত-যাইত-পাইত-পারিত', কারণ রবীন্দ্রনাথ এখন গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করবেন, রতন ও পোস্টমাস্টারের সম্পর্ক গড়ে তুলবেন, খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যাবেন না, কারণ সেটা গল্পের প্রথম পর্যায়ের সংহত সংক্ষিপ্ত রূপাভাসের সঙ্গে বেমানান হবে, তবে একেবারে মোটা দাগেও কাজ করা হবে না, কারণ এতে আবার পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিক ফুটে উঠবে না। আসলে রতন ও পোস্টমাস্টারের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই সামান্য বস্তু ও বিষয়-নির্ভর যে মোটা দাগের কাজে হয় তা হাস্যকর অথবা দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই এবার স্কেচ ধরনে কিছু ছবি আঁকবেন, এবং দু'একটি ঘটনা বলবেন যা কোনো ঘটনাই নয় অথচ খুব গভীরভাবে জরুরী ঘটনা; এবং এ সবই বর্ণিত হবে ক্রিয়াপদের এমন একটি চেহারায় যা আমাদের মনে এমন ভাব সৃষ্টি করবে যে, এ একদিনের নয়, প্রতিদিনের কথা, ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে এমন একটি আলোছায়ার খেলা। 'সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে

ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি হৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালাইয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না—বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ।'

এইভাবে, ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি অবলম্বন করে, ছোট ছোট ছবি এঁকে, সাধারণ বর্ণনাও সেই কথক ভদ্রলোকটির কণ্ঠে ঈষৎ বেদনায় রঞ্জিত করে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে যান গল্পের তৃতীয় পর্যায়ে—এবং এই উত্তরণটি সঙ্গে সঙ্গে আমরা সনাক্ত করতে পারি ক্রিয়াপদের নতুনতর একটি রূপের সাক্ষাতে— 'হইল-পারিল-বলিল'। এই রূপটি এই প্রথমবারের মত এ গল্পে প্রয়োগ করলেন আমাদের গল্পকার। 'পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ার তলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' ক্রিয়াপদের এই নতুন রূপটি হঠাৎ আমাদের দুলিয়ে দিয়ে গেল; নীরব চিত্র সবাক হয়ে উঠল; সময়ের অতীত-বর্তমান যে মিলেমিশে গিয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে, এখন আমরা নেমে পড়লাম চলমান সময়ে। উলাপুর গ্রামে এল বর্ষা, খাল-বিল-নালা জলে ভরে উঠল, কলকল খলখল জলের এই আগমন খুব অল্পদিনের ভেতরেই অশ্রুসাগর হয়ে দেখা দেবে, কিন্তু এখনও তার সে ভূমিকা নয়, এখন তার কাজ আমাদের গল্পে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 'একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল, 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

ক্রিয়াপদের এই রূপ ধরেই আমরা এগিয়ে যাই পোস্টমাস্টারের অসুস্থ হয়ে পড়া, রোগমুক্তি ও উলাপুর ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। গল্পের এই তৃতীয় স্তরের অন্তিমে, গল্পের শেষ বাক্যটিতে এসেই কেবল, ক্রিয়াপদের রূপটি আবার ফিরে যায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত ছোঁয়া সময়ে, যে বাক্যটি আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি।

কিন্তু এই অবিস্মরণীয় শেষ বাক্য, যা এই গল্পটি লেখার কারণ, তার আগে রয়েছে দীর্ঘশ্বাসজড়িত এই উচ্চারণ, 'হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়।' এই উচ্চারণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন কথকের সমুখে এতক্ষণ আমরা বসে ছিলাম, তিনি এখন তাঁর কথা শেষ করে আনছেন। কিন্তু আমরা কি চমকে উঠি না এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো শুনে? রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই রতনকে উল্লেখ করে এসেছেন 'বালিকা'; বয়স বলেছেন 'বারো-তেরো'; যদিও যে-কালের গল্প সেকালে এই বয়সে বালিকারা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে বসে আছে, তবু তিনি রতনকে এমনভাবে আঁকেননি যাতে আমাদের

মনে হতে পারে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। আমরা এতক্ষণ এমন একটি কাহিনী শুনছিলাম যাকে আমরা স্নেহ, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব—এইসব রসের অন্তর্গত বলেই বিশ্বাস করছিলাম; দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত ঐ একটি খেদবাক্যে আমাদের চমক ভাঙ্গল, আমরা অস্বস্তি বোধ করে উঠলাম; গল্পটির দিকে আবার ফিরে তাকালাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনোই নির্ভেজাল বাৎসল্য রসের কাহিনী নির্মাণ করতে কলম ধরেননি; প্রথম থেকেই তিনি একটি প্রেম রচনা করে আসছেন এই গল্পে। গল্পটি তবে আবার পড়া যাক।

এবার আমরা গল্পের শুরুতেই আবিষ্কার করতে পারব—উল্লেখিত হয়েছে রতন সম্পর্কে, যে, তার 'বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।' অর্থাৎ তার বিয়ের বয়স চলছে অথবা তখনকার সামাজিক দৃষ্টিতে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে; পোস্টমাস্টার সেই সমাজের বাইরের মানুষ নয়, অতএব রতনকে সে বিয়ের যোগ্য মেয়ে বলেই দেখবে, এটা স্বাভাবিক। এবং এই বাক্যের কিছু পরেই পোস্টমাস্টার প্রথম যে 'রতন' বলে ডাক দেয়, সেই বাক্যটিও নতুন করে আমাদের চোখে পড়বে। 'যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, 'রতন'।' লক্ষ করব কয়েকটি শব্দ— কবিহৃদয়, হৃৎকম্প, প্রদীপ; রবীন্দ্রনাথ কি যথেষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন না একটি অনুভবের যা প্রেমের দিকে অগ্রসরমান? প্রদীপ জ্বালানো নিতান্ত একটি সাংসারিক কাজ হতে পারে, লেখক সে ঘটনা কল্পনা করেন, একটি কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কিন্তু কল্পনা করেন। আরো কিছু পরে আরো কিছু আবিষ্কার করব আমরা। পোস্টমাস্টার তার বাড়ির গল্প করছে রতনের কাছে, 'অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি তাহার ক্ষুদ্রহৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।' এখন আমরা না ভেবে পারব না, রতন কি কখনো পোস্টমাস্টারের পরিবারের ভেতরে নিজেকে দেখতে পেত? দেখলে কী ভূমিকায় সে নিজেকে দেখত? কেনই বা সে একদিন পোস্টমাস্টারকে বলে, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?' তখন তার উত্তরে পোস্টমাস্টার যে বলেছিল, 'সে কী করে হবে?' রবীন্দ্রনাথ অচিরে লিখেছেন, 'সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে।' একি প্রেম নয়? যার কানে একটি অসম্ভব আবদারের সঙ্গত উত্তর স্বপ্নে জাগরণে বাজে, সে প্রেমের অধিকারে রয়েছে। তবু যদি আমাদের সন্দেহ থাকে, রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই লিখেছেন কয়েকটি বাক্য পরেই, আমরা এর আগে এতটা লক্ষ্য করিনি, এখন করব এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলব, এই তো এখানে। পোস্টমাস্টার রতনকে বলছে, 'রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে?' নারীহৃদয়? বালিকা নয়? নারী? এ গল্পে এর আগে তো কখনো রতন নারী বলে উল্লেখিত হয়নি। পোস্টমাস্টারের বিদায় আসন্ন, এখন আর প্রচ্ছন্ন রাখা কেন? রবীন্দ্রনাথ

লিখছেন, 'রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে।' পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।'

অবাক হবার কথাই তার। কারণ, প্রেমে পোস্টমাস্টার পড়েনি, পড়েছে রতন। একবার শুধু পোস্টমাস্টারের একটুখানি তৃষ্ণা হয়েছিল, যখন 'এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘন বর্ষায় রোগকাতর শরীর একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কারণ, আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, গল্পের শুরুতেই আমরা জেনে গেছি, পোস্টমাস্টার 'কলিকাতা'র ছেলে, উলাপুরে সে ডাঙায় তোলা মাছ, এবং অপরিচিত স্থানে সে উদ্ধত হলে বরং একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত, কিন্তু দেখাই গেছে, সে দ্বিতীয় দলের মানুষ—'অপ্রতিভ'। এবং হৃদয়হীন, অন্তত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রচনা ও রক্ষার ব্যাপারে। তাই সে নিজের প্রয়োজনে রতনকে কাছে ডাকে, কিন্তু উলাপুর ছেড়ে যাবার কথা রতনকে জানাবার প্রয়োজনটিও বোধ করে না। রতনকে যখন সে জানায়, স্মরণ করুন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।' —বহু বাড়ির ভৃত্যও তার দু'চারদিন আগে খবরটা মনিবের কাছে পায়। রতনের প্রেম তার আপনার গড়া; রতনের প্রেম তার আপনার ভেতরেই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত; আমরা করুণ আর কাকে বলব যদি একে না বলি যখন রতন একবার, মাত্র একবার 'উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া ওঠে?' আমরা জীবনের কঠিন সত্য আর কাকে বলব যদি একে না বলি যখন আমাদের 'দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

পোস্টমাস্টার, মাত্র হাজার দেড়েক শব্দে, দুটি মাত্র চরিত্র নিয়ে রচিত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি প্রেমের গল্পই নয়, আমি মনে করি জটিলতম একটি গল্প— অনুভবের দিক থেকে এবং নির্মাণের দিক থেকে। এ গল্পের কলকব্জা কিছুটা খুলেই আমরা দেখতে পেয়েছি কত সূক্ষ্ম এর কারিগরি এবং অতঃপর আমাদের কেউ কেউ সারল্যের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কি এর কারিগরি দিক বিস্তারিত ভেবে নিয়েই গল্পটি লিখেছেন, অথবা তাঁর হাতে 'এসে গেছে'? আবারো বলতে হয় সব কিছুর মতো গল্প লেখাও শিখতে হয়, কোনো কিছুই 'এসে যায়' না। তবে, এক অর্থে 'এসে যায়', যখন দুটি বিষয়ে গল্প লেখক অধিকারী থাকেন। এক, এই যে আমি দেখছি, আমার আগেও অনেকে দেখেছে, আমার পরেও অনেকে দেখবে, কিন্তু যেমন আমি দেখেছি তেমন করে আর কেউ কখনো দেখেনি, অতএব আমাকে লিখতেই হচ্ছে। দুই, মহৎ বক্তব্য মহৎ শিল্প তৈরী করে না, মহৎ বক্তব্যই বরং এ জগতে বড় সুলভে বিনা যাঞ্চায় পাওয়া যায়, মহৎ বক্তব্য মহৎ শিল্পে অনূদিত হয় শুধু করিগরি দক্ষতা ও উদ্ভাবন বলে।

রবীন্দ্রনাথের *নিশীথে*

'নিশীথে'—রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্প, বাংলা ১৩০১ সনের মাঘ মাসে রচিত; এর নির্মাণ আমাদের নিয়ে যায় কিছু বিস্ময় এবং আবিষ্কারের ভেতরে।

অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে বাংলা ভাষায় গল্প, যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি ভূতের গল্প, ভয়ের গল্প, বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল লোকমুখে; বস্তুত পক্ষে, অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা মানুষের সাধারণ একটি সামাজিক প্রতিভা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের আর কোনো লেখক সাহিত্যের জন্যে এই বিশেষ উপাদানটি হাতে নিয়েছেন বলে জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ যদিও 'নিশীথে'র বছর দুয়েক আগে লিখে ফেলেছেন 'কঙ্কাল', যেখানে অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে তাঁর প্রথম নাড়াচাড়া, কিন্তু ভয়ের চেয়ে স্মিত কৌতূহলই সেখানে বরং বেশি কাজ করে, এবং 'কঙ্কাল'-এর পরের বছর 'জীবিত ও মৃত', যেখানে তাঁর অসামান্য পরীক্ষাটি, যে, বাস্তবতার ষোলো আনা ভেতরে থেকেও অতিপ্রাকৃত এক আবহ রচনা করা যায় কিভাবে; —বলা যায়, 'নিশীথে'ই তিনি লিখলেন আমাদের সাহিত্যের প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্পটি সত্যিকার অর্থে। এখনই আমরা জেনে রাখি না কেন, যে, এর মাত্র ছ'মাসের মাথায়, ১৩০২ সনের শ্রাবণ মাসে, ভাবতে ভালো লাগে বৃষ্টিমথিত কোনো রাতে, রবীন্দ্রনাথ লিখবেন, আগামী একশো বছরের জন্যে তো বটেই, তারও বেশি কিনা কে জানে, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্পটি—'ক্ষুধিত পাষাণ'।

কিন্তু 'নিশীথে'র সূত্রে যে আবিষ্কারের কথা বলেছি তা এ সবে নয়, এ নিতান্তই তথ্য; তথ্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য স্তরে এ আবিষ্কারটিতে আমরা পা রাখব। তবে তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, তার আগে 'নিশীথে'র বিস্ময় ও প্রশ্নগুলোর দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

বিস্ময় তো নামেই; রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে যে নব্বইটি ছোটগল্প লিখেছেন তার কোনোটির সঙ্গে আমাদের হাতের এই গল্পটির নাম মেলে না—'নিশীথে'। যেমন মনে আসে, তাঁর কিছু গল্পের নাম উচ্চারণ করা যাক— ঘাটের কথা, মুক্তির উপায়, দান-প্রতিদান, ইচ্ছাপূরণ, নষ্টনীড়, মাস্টার মশায়, স্ত্রীর পত্র, অতিথি, আপদ, মণিহারা, মানভঞ্জন, কাবুলিওয়ালা। না, 'নিশীথে'র সঙ্গে এরা মেলে না; রবীন্দ্রনাথের সব গল্পের নাম একদিকে, এ গল্পের নাম আরেক দিকে, একা; তাঁর নব্বইটি গল্পের নামের তালিকার দিকে তাকিয়ে আমরা এবার একটি সংবাদ পাই—একমাত্র তাঁর 'নিশীথে' ছাড়া আর কোনো গল্পের নাম এ-কার দিয়ে শেষ হয়নি। তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গল্প বা উপন্যাসের নাম এ-কারান্ত নয়; আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, 'নিশীথে'র পূর্ব পর্যন্ত গোটা বাংলা সাহিত্যেই এ রকম এ-কারান্ত নাম নিয়ে কোনো গল্প বা উপন্যাস

নেই; আমাদের আরো বিস্ময়, 'নিশীথে'র পরেও বহুদিন পর্যন্ত এ একটিই মাত্র উদাহরণ। আমাদের কারো কারো হয়ত মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ নিজে আর একবার মাত্র তাঁর একটি কথার নাম এ-কারান্ত দিয়ে রেখেছিলেন—'ঘরে বাইরে' ভেতরে বা অধিকারে বোঝাবার বদলে এক পরিস্থিতিযুগলকেই বেশি প্রকাশ করছে, খুব মনোযোগ না করলে এ-কার দুটি ভালো করে শোনাও যায় না; কিন্তু 'নিশীথে'র বেলায় ঐ একই এ-কার ধাতব ধ্বনির মতো বেজে ওঠে, যেনবা ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি, এই ধ্বনি আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে বহে যায়, গল্পের জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠি।

গল্পটি এই, যে, এক ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে জ্যোৎস্নার ভেতরে বলেছিলেন, 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।' কথাটি শুনে তাঁর স্ত্রী হেসে উঠেছিলেন। সেই স্ত্রী যখন মৃত্যুর দিন গুনছেন, এক সন্ধ্যায় স্বামী তাঁর শয্যাপাশে, এক যুবতী এসে দরোজায় দাঁড়ায়। এই যুবতী সম্পর্কে স্বামীটির দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল, স্ত্রী যখন অপরিচিতাকে দেখে চমকে প্রশ্ন করলেন, 'ও কে?' স্বামী অপরাধ গোপনের তাৎক্ষণিক চেষ্টায় বলে ফেললেন, 'আমি চিনি না।' পর মুহূর্তেই অবশ্য তিনি সত্যি কথাটা বলেছেন, 'ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা।' কিন্তু এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই এ গল্পের যাবত প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়ে গেল, এখন বাকি রইল শুধু শস্যছেদন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীটি ঐ 'ডাক্তার বাবুর কন্যা'কে বিয়ে করেন, কিন্তু একটি হাসি তাকে তাড়া করে ফেরে, একটি প্রশ্ন, 'ওকে? ও কে? ও কে গো?' তাঁর হৃদয়যন্ত্রের ধ্বনির চেয়েও বিকট হয়ে বাজে; তাঁর জীবন থেকে সুখ, স্বস্তি, সাহস আশাহীনভাবে বিদায় নেয়।

গল্পের নাম দেবার যে অভ্যেস আমরা লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথে, আমাদের আপত্তি করবার কিছুই থাকত না যদি তিনি এ গল্পের নাম দিতেন, তাঁরই অন্য কিছু গল্পের নাম ধার করছি, 'জীবিত ও মৃত'—বটেই তো, 'নিশীথে' গল্পে জীবিত ও মৃতের টানাপোড়েন; কিংবা 'প্রতিহিংসা'— আমরা এরও যৌক্তিকতা খুঁজে পেতাম; 'নষ্টনীড়' —এছাড়া আর কি তবে? 'কর্মফল' —তাও নিতান্ত মন্দ হতো না, কাজ চলে যেত; অথবা 'নিশীথে'র একেবারে কাছাকাছি 'একরাত্রি'; কিংবা শুধুই 'নিশীথ'।

কিন্তু 'নিশীথে'? আমরা চমকে উঠি। যেন ১৩০১ সনের নয়, আরো পরের, যাকে আমরা তিরিশ দশক বলি যেন সেই দশকের কোনো গল্প; যেন রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর পরের কোনো লেখকের লেখা গল্পের এটি নাম। বাংলা ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি, সেই প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই কোনো গল্পের নাম হতে পারত 'নিশীথে'; লেখার চল্লিশ বছর পরেও এ নাম রবীন্দ্রনাথের অনুজ এক লেখকের কলমে এতটুকু বেমানান হতো না। তবে কি আমরা বলব, কাল ডিঙিয়ে গল্পের এহেন নামকরণ নিতান্ত আকস্মিক? যিনি আমাদের ভাষায় লেখার এতবড় একজন কারিগর, তাঁর লেখায় কোনো কিছু দৈববশে, খেয়ালবশে, বিনা অভিপ্রায়ে আসবে, এ হতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথেরই অন্য কোনো গল্পের সঙ্গে যখন এই গল্পটির নামের কোনো আত্মীয়তা নেই, তখন নিশ্চয়ই আমরা জানব এর কারণ আছে; আমরা এই অভাবিত অপূর্বতার কারণ খুঁজব আর কোথাও নয়, এই গল্পের ভেতরেই।

এই গল্পের দ্বিতীয় বিস্ময় এর প্রথম তিনটি বাক্য। আড়াইটে বলা সঙ্গত; কারণ তৃতীয় বাক্যটি অসম্পূর্ন রাখা হয়েছে । পড়া যাক।

'ডাক্তার। ডাক্তার।'
'জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—'
গল্প শুরু হয়েছে সংলাপ দিয়ে; আমরা লক্ষ করব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের নব্বুইটি ছোট গল্পের ভেতরে এই 'নিশীথে'র দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে লেখা আর মাত্র একটি গল্প 'শেষের রাত্রি' শুরু করেছেন সংলাপ দিয়ে। আর একটু এগিয়ে লক্ষ করব, 'শেষের রাত্রি'র উদাহরণ সত্ত্বেও, 'নিশীথে' সংলাপ দিয়ে শুরু হবার ক্ষেত্রে অনন্য, কারণ, এখানে বক্তার কোনো ইঙ্গিত অবিলম্বে দেয়া হয়নি, দেহহীন একটি উচ্চারণ হিসেবে সংলাপটি এসেছে। তৃতীয় যে বাক্যটি অসমাপ্ত রাখা হয়েছে—'এই অর্ধেক রাত্রে .....' যা কিনা ডাক্তার ভদ্রলোকটিরই স্বগতোক্তি, আমাদের কৌতূহলী করে তোলে যে, কে ডাকছে। এবং আমরা সংবাদ পেয়ে যাই—'চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।' আমরা জানতে চাই রবীন্দ্রনাথ কোন ফললাভের আশায় সংলাপ দিয়ে গল্প শুরু করবার মতো তাঁর অভ্যেসের বাইরে প্রায় নজিরহীন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এবং হলোইবা স্বগতোক্তি, একটি অসমাপ্ত বাক্য 'এই অর্ধেক রাত্রে' জুড়ে দিয়েছেন, যার নজিরও গোটা রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে হাতে গোনা দু'চারটের বেশি পাওয়া যায় না। আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন এই গল্পের বীজ হাতে নিয়েছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন এর চরিত্রগুলো বাস্তব, ঘটনা বাস্তব, সমস্যা বাস্তব, কিন্তু গল্পটির আসল ক্ষেত্র কল্পনা— দক্ষিণাচরণবাবুর, এবং একমাত্র তাঁরই করোটির অভ্যন্তর। স্মরণ করা যাক গল্পের একেবারে শেষ দিকে এ গল্পের দীর্ঘতম বাক্যটি; দক্ষিণাচরণবাবু পদ্মার বুকে রাতের পাখির ঝাঁক উড়ে যাবার শব্দ শুনেছেন, আগেও একবার এ রকম শব্দ তিনি শুনেছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল ওটা তাঁর মৃত পত্নীর 'মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার'; এবার সেই 'হাহা করিয়া একটা হাসি' তাঁর বর্ণনায়, 'পদ্মা পার হইলে, পদ্মার চর পার হইলে, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্ম মৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না।' আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করব এই কথাটি, যে, 'আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে'—এবং উপলব্ধি করতে পারব রবীন্দ্রনাথকে এ গল্পের জন্যে কোন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সমস্যাটি এই ছিল, সংক্ষেপে— মাথার ভেতরে অনন্ত যে আকাশ, তার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার দূরত্ব বিনাশ করা। যে গল্প করোটির ভেতরে ঘটছে, যে গল্প আসলেই হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যাচ্ছে না, সেই গল্পটিকে পেশী দেয়া যায় কি উপায়ে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নির্ণয় করে নেবার সমস্যা। যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখককেই লেখার আগে এই একটি কাজ করে নিতে হয়— কারিগরি দিকটি ভেবে নিতে হয় এবং যে সিদ্ধান্তই তিনি নিন না কেন

তা ব্যাকরণ দিয়ে বোঝা যাবে না, নিয়মের গজকাঠি ফেলে মাপা যাবে না, সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল কিনা জানতে হলে পুরো লেখাটাই লিখে ফেলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আমরা জানি না, 'নিশীথে'র কারিগরি দিক ভাবতে কতটা সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু গল্পটি পড়ে এবং পরীক্ষা করে এখন আমরা জানি তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, যে, এ গল্প তিনি লিখবেন তাঁর অন্যান্য গল্পের চেয়ে অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য করে— যেনবা, একালে হলে বলা যেত, সবাক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো করে। বস্তুতপক্ষে আমরা 'নিশীথে'র বাক্যের পর বাক্যে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে দেখি, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সমস্ত কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, আকারসম্পন্ন করে তুলতে চাইছেন। যেমন চোখে পড়ে তেমন, কিছু বাক্য আমরা দেখি না কেন? 'তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া ছিলেন।'.... 'তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্ত গগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।'...'এমন সময় অন্ধকার ঝাউ গাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল।' ....'তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে।'.... 'গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে।' আমরা লক্ষ করব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য গল্পের তুলনায় আরো কিছু অধিক এগিয়ে কিভাবে আমাদের সমুখে চিত্রের পর চিত্র রচনা করে চলেছেন, বিমূর্তকে মূর্তরূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

করোটির ভেতরের গল্পকে এরকম দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার শরীরে প্রকাশ করা— হঠাৎ মনে হতে পারে এর ভেতরে পরস্পর বিরোধিতা আছে; কিন্তু ইনি রবীন্দ্রনাথ, এবং আকাশ ও ভূমির একই সমতলে অবস্থান তাঁর করতলেই সম্ভব।

সবাক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কথা বলেছি, কতটা দৃষ্টিগ্রাহ্য করে এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করতে চেয়েছেন, বোঝাতে। দেখা যাক চিত্রনাট্যের চোখ দিয়েই এ গল্পের প্রথম কয়েকটি বাক্য। অবিকল চিত্রনাট্যের ভঙ্গীতেই শুরু করা হয়েছে গল্পটি; প্রথম শট— ঘুমিয়ে আছে ডাক্তার, তার ওপরে নেপথ্য ডাক, 'ডাক্তার। ডাক্তার।' সে বড় বিরক্তি নিয়ে চোখ মেলে, যার ভাষারূপ 'জ্বালাতন করিল,' একই শটে সে পাশ ফেরে, পিছিয়ে আসে ক্যামেরা, বিছানার পাশে টেবিল ঘড়ি একটুখানি দেখা যায়, ডাক্তার চোখ মেলে তাকায়। দ্বিতীয় শট— ডাক্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে জমিদারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তৃতীয় শট— ডাক্তার ধড়ফড় করে উঠে বসে, জমিদারকে বসতে দেয়, ডাক্তার আড়াচোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। চতুর্থ শট— ঘড়িতে আড়াইটে বাজে।

'নিশীথে' গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ভাবে চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে, কান দিয়ে শোনা হয়েছে; যেনবা সবাক চলচ্চিত্রের আগেই রবীন্দ্রনাথের হাতে চিত্রনাট্যর পূর্বাভাষ এই রচনায়; আমরা লক্ষ করি, কিভাবে কখনো চিত্র, কখনো ধ্বনি, কখনো আবার চিত্র ও ধ্বনি একই সঙ্গে, এবং শেষ পর্যন্ত শুধু ধ্বনি এই গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধ্বনির শেষ প্রধান কাজটি—'সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘন্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, 'ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।'

আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, আমরা ঘড়ির শব্দের সঙ্গে, প্রথমা স্ত্রীর ব্যাকুল প্রশ্নটির এবং দক্ষিণাচরণবাবুর হৃদয়স্পন্দনের এক শব্দ-মিশ্রণ শ্রবণ করে উঠি, বস্তুতপক্ষে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের কাছে এই ধ্বনিস্পন্দন জগতের একমাত্র স্পন্দন হয়ে ওঠে। এবং এরপর যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের ফিরিয়ে আনেন আমাদের ভেতরে, দক্ষিনাচরণবুকে ডাক্তারের সমুখে, দেখুন কিভাবে ধাপে ধাপে কাজটি সম্পাদন করেন তিনি। 'আমি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, 'একটু জল খান।' এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল।' ধাপগুলো হিসেব করি—কেরোসিনের বাতি নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে জোরালো আলো, দিনের প্রথম আলোয় ঘর জেগে উঠল। তখন জানালার বাইরে লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন উর্ধ্ব আকাশে, যেখানে দিনের উৎস, তারপর একটু নিচে— কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে, আরো নিচে চোখ রাখছি এবার— দোয়েল, এবং আরো নিচে, এখন মাটিতে পৌঁছে গেছি আমরা.—মহিষের গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চলেছে। এই যে চিত্র এবং ধ্বনির ব্যবহার, এ ছিল রবীন্দ্রনাথের কারিগরি সিদ্ধান্ত এই গল্পটির জন্যে।

তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল, বাস্তবতার শরীরে এ গল্প বলবেন। আমরা তাই লক্ষ করি, মাথার মধ্যে সেই অনন্ত আকাশ, একটি ধ্বনির কিছুতেই 'মস্তিষ্কের সীমা' ছাড়াতে না পারা এবং জগতের অন্তঃস্থল পর্যন্ত 'ও কে, ও কে গো'—র অভিঘাত শোনা, এই উন্মত্ততার ভেতরে ঠেলে দেবার পূর্ব পর্যন্ত খোঁচা দিয়ে আমাদের জাগিয়ে রাখবার জন্যে, রবীন্দ্রনাথ এ গল্পটিকে মাঝপথে তিন তিনবার থামিয়ে দিয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারব, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে বক্তা সেই যে একবার গল্প শুরু করলেন, যখন থামলেন তখন রবীন্দ্রনাথেরও গল্প শেষ; একইভাবে টানা শেষ হয়েছে 'মনিহারা'; কিন্তু 'নিশীথে' এর ব্যতিক্রম, গল্পের বক্তা দক্ষিণাচরণবাবু তিনবার থেমেছেন গল্প বলতে গিয়ে। এবং এই তিনবারই যে কারণ দেখিয়ে গল্প থামানো হয়েছে, আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—দরকার ছিল কি? প্রথমবার যেখানে গল্প থামানো হয়েছে, থামিয়ে যে অনুচ্ছেদটি রচনা করা হয়েছে তা কার্যত আমাদের কিছুই বলে না। 'এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভনভন শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—' এই অংশটি বাদ দিয়ে আমরা যদি পড়ি তাহলে গল্পের এই জায়গাটা দাঁড়ায় এরকম—'ডাক্তার বলিল, 'একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।' আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম। সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।' আমরা কি ধরতে পারি যে 'এলাহাবাদে গেলাম' আর 'সেখানে হারান ডাক্তার' –এর মাঝখানে ছিল ছেদ এবং ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি? দ্বিতীয়বার যেখানে গল্পে বাধা দেয়া হয়েছে, সেখানেও যে ছোট্ট অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তা না থাকলে এবং গল্প এক টানে এগিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল না বলেই আবারো আমাদের মনে হবে। তৃতীয়বার যেখানে গল্পে বাধা

দেয়া হয়েছে, সেখানে ছোট্ট একটা কথা উঠতে পারে, যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর দক্ষিণাবাবুর দ্বিতীয় বিয়ে করার মাঝখানে একটু সময় দেয়া দরকার, তাই গল্পে ছেদ আনবার কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি টেঁকে না, কারণ, আগের দু'বার যদি টানা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত গল্প, তাহলে এখানেও রবীন্দ্রনাথ একটি কোনো বাক্য দক্ষিণাবাবুর মুখে বসিয়ে দিয়ে তরতর করে এগিয়ে যেতে পারতেন; হয়ত একটি সম্পূর্ণ বাক্যেরও দরকার হতো না, বাক্যাংশই যথেষ্ট হতো, যেমন—'কিছু দিন পর', রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন 'কিছুদিন পর মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল, শেষ অভিঘাতের জন্য আমাদের প্রস্তুত করা, বারবার বাস্তবে ফিরিয়ে এনে আমাদের শেষ ধাক্কাটি দেওয়া।

গল্পে তৃতীয় বার বাধা দেবার জায়গাটি হচ্ছে—'ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।' এরপর দক্ষিণাচরণবাবু জল খেলেন; এবং এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে দিলেন, আমরা দক্ষিণাচরণবাবুর মুখে গল্প শুনছিলাম; রবীন্দ্রনাথ যেন গল্প থামিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, এ গল্পের শোক তাপ পাপ কৌতুহল যদি আমাদের মনে কিছুমাত্র সঞ্চারিত হয়েও থাকে, আমরা তবু নিরাপদেই অদগ্ধ অবস্থায় আমাদের বাস্তবে ফিরে আসতে পারব। এরপর যখন রবীন্দ্রনাথ আবার গল্প শুরু করবেন, একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর থামবেন না এবং এতক্ষণ ধরে তিনি যে পুঙ্খানপুঙ্খ বর্ণানা, চিত্রের পর চিত্র রচনা করে আসছিলেন এবার তার সঙ্গে যোগ করবেন নতুন এক মাত্রধ্বনি এবং ভয়াবহভাবে মথিত মিশ্রিত এক ধ্বনি দিয়েই তিনি শেষ করবেন গল্প। 'নিশীথে'র এই শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই গোটা চারেক বাক্যে কয়েকটি দরকারী তথ্য দিয়ে, শিল্পের ইন্দ্রজাল দ্রুত সৃষ্টি করতে থাকবেন এভাবে—'একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছমছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।' লক্ষ করব, রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের প্রস্তুত করছেন পরিণতির জন্যে, ক্ষেত্র তৈরী করছেন, লিখছেন এ গল্পে এই প্রথম—'ছমছমে অন্ধকার,' আমাদের কান তৈরী করছেন 'পাখিদের ডানা ঝাড়ার শব্দ' বলে, কারণ, আজ, এই সন্ধ্যাবেলাতেই 'ঝাউগাছের শিখরদেশে' আগুণ ধরিয়ে চাঁদ ওঠাবেন তিনি, 'সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা' 'রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না' ফেলবেন তিনি এবং দক্ষিণাচরণবাবুকে দিয়ে বলাবেন—'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।' অতঃপর দক্ষিণাচরণবাবু ডাক্তারের মারফত আমাদের বলবেন—'কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা ...হাহা... হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।' আমাদের আর সন্দেহ থাকে না, রবীন্দ্রনাথ যে 'পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ' বা তার অনুপস্থিতি একটু আগে উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল গভীরভাবে পরিকল্পিত, কারণ, পাখিদের দিয়েই তো তিনি এবার

এক বিপর্যস্ত মনের সঙ্কেত আমাদের দিতে থাকবেন। দেখতে পাবো, এই প্রথমবারের পর আবার পদ্মার চরে জ্যোৎস্নার ভেতরে মনোরমার মুখ চুম্বন করবার সঙ্গে সঙ্গে—'গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, ' ও কে? ও কে? ও কে?' আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক।' আমাদের মনে পড়বে, গল্প শেষ হয়ে যাবার পর, রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের জাগিয়ে তোলেন, আমাদেরই ভেতর আবার ফিরিয়ে আনেন আমাদের, তখন যে চারটি চিত্র ও ধ্বনি তিনি প্রয়োগ করেন, বাক্যটি আমি কিছু আগেই উদ্ধৃত করেছি, তার দুটিই পাখিদের।

আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছি, গল্পের কারিগর হিসেবে কি ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। তিনি চেয়েছেন, করোটির ভেতরে গল্পটিকে বলবেন আপাতদৃষ্টে উল্টো এক ভঙ্গী ও আঙ্গিকে এবং এভাবে বাস্তবের গায়ে কল্পনার ও কল্পনার গায়ে বাস্তবের চাপড় মারতে মারতে, পাঠককে ডানে বাঁয়ে অবিরাম ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই তিনি চিত্রনাট্যের পূর্বাভাষ সম্বলিত চোখ ও কান ব্যবহার করেছেন, অপ্রত্যাশিত ও নজিরবিহীনভাবে সংলাপ দিয়ে গল্প শুরু করেছেন, গল্প ঘন করে তুলেও মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন তিন তিন বার, গল্পের চারটি অংশের প্রথম তিনটি পর্যন্ত আমাদের তিনি রেখেছেন ভূমির স্তরে, তৃতীয় অংশ পর্যন্ত আমাদের তিনি এমন বিভ্রান্ত রেখেছেন যেন আমরা যে গল্প শুনছি তার উপাদানগুলো যেমন বাস্তব, পরিণতিও হবে তেমনি বাস্তব— দ্বিতীয় বিয়ে মাত্র, এর বেশি কিছু নয়।

এতক্ষণে আমরা প্রস্তুত হয়েছি একটি আবিষ্কারের জন্যে; সেই যে আমরা শুরুতে বলেছিলাম গল্পের নাম নিয়ে কিছু কথা; 'নিশীথে' নামের এই অভাবিত অপূর্বতার কারণটি এখন আমরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব।

গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণ, তিনি জমিদার; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কল্পনা করেছেন সংবেদনশীল একজন মানুষ হিসেবেই কেবল নয়, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হিসেবেও। দক্ষিণাচরণের নিজের কথাতেই, 'কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।' আমরা দেখি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থাতেও তিনি কালিদাসের শ্লোক স্মৃতি থেকে নির্ভুল উচ্চারণ করতে পারেন। আমরা প্রমাণ পাই, জীবনের কঠিন সত্য এই ব্যক্তিটির কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না; বরং তাঁর প্রথমা স্ত্রী তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবতবুদ্ধিসম্পন্ন; স্মরণ হয় আমাদের, দক্ষিণাচরণ যখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে এ গল্পের শুরুর দিকে বলেছিলেন, 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালেই ভুলিব না' তখন এর শূন্যগর্ভতা চোখে পড়েছিল তাঁর স্ত্রীর এবং কথাটি শুনে তিনি হেসে উঠেছিলেন। আমরা আরো লক্ষ করব, দক্ষিণাচরণ লম্পট নন; স্ত্রী বর্তমানেও তিনি যে অন্য যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, সে কখন? যখন 'এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম।' —সেই তখন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং কারো কারো ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে জানি, মৃত্যুর সমুখে দিনের পর দিন বসে থাকা যায় না, চোখের ওপর উদ্যত স্তম্ভিত মৃত্যু রাতের পর রাত অবলোকন করা যায় না— এই হচ্ছে সর্বকালের সর্বদেশের জীবনের কঠিন সত্য। আমরা আরো স্মরণ করব, দক্ষিণাচরণ যে-কালের মানুষ তখনকার মূল্যবোধ, জীবন যাপন ও সামাজিক আচরণের কথা। আমরা

দেখতে পাবো, 'নিশীথে'র কালে এবং সমাজে, পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ে তো গ্লানিকর নয়ই, স্ত্রী বর্তমানে রক্ষিতাপোষণ ও বারবনিতাগমন পর্যন্ত চিত্তের ও সমাজের সুস্থতা নষ্ট করে না।

এবার আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি, যে, দক্ষিণাচরণ এমন কিছু করেন নি যার জন্যে সমাজ তাঁকে তিরস্কর করবে, নিজে তিনি নিজের কাছে খাটো হবেন, তাঁর রাতের ঘুম হরে যাবে। আমরা স্বীকার করে নিতে পারি, দক্ষিণাচরণ তাঁর স্ত্রী বর্তমানে মনোরমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনোরমাকে বিয়ে করে, তাঁর কালের বিচারে খুব সাধারণ একটি ঘটনার ভেতর দিয়েই গেছেন। কিন্তু গল্পের দক্ষিণাচরণকে আমরা দেখেছি, তিনি পাপবোধে জর্জরিত, গ্লানিতে, নিমজ্জিত, অনুতাপে দগ্ধ এবং শোবার ঘরে মনোরমাকে নিদ্রিত রেখে, জমিদার হিসেবে নিজের অবস্থান ও মর্যাদা ভুলে, তাঁরই বেতন-ভোগী পল্লীর এক চিকিৎসকের কাছে রাত আড়াইটেয় ছুটে গেছেন— না, কোনো ওষুধের জন্যে নয়, অন্তরের গোপনতম পাপটি স্বীকার করে চিকিৎসিত তথা অনুশোচনা থেকে কিছু পরিমাণে হলেও মুক্ত হতে। গল্পের শেষ ব্যাক্যটিতে আমরা যে পড়ি, 'সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, 'ডাক্তার। ডাক্তার।'—আমরা জানি, আজো তিনি ওষুধের জন্যে নয়, স্বীকারোক্তির জন্যেই এসেছেন; কিন্তু আমাদের শঙ্কা এই, চিরদিনের মতো নিজের কাছে নিজে তিনি ধিক্কৃত হয়ে থাকবেন, পাপবোধ এ জীবনে তাঁকে আর ত্যাগ করবে না। হোন না তিনি সংবেদনশীল ও কালিদাসের কাব্যরসিক, এই পরিস্থিতি ও পরিণতি তাঁর কালের একজন বড়-মানুষের পক্ষে, অচিন্তিত এবং অপ্রত্যাশিত। আমরা এখন সনাক্ত করতে পারছি, যে, দক্ষিণাচরণের মানসিক এই প্রতিক্রিয়া আদৌ তাঁর স্বকালের নয়; এটা আরো অন্তত দুটি প্রজন্মের পরের মানুষের প্রতিক্রিয়া। তাই 'নিশীথে'র সামাজিক পটভূমি এবং রচিত গল্পটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে আমরা এখন বলতে পারি, কালের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা একটি গল্প লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পটির আঙ্গিকেই দূর ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দিয়েছেন— সবাক চলচ্চিত্রের বহু আগেই এ গল্পে তিনি ব্যবহার করেছেন চিত্রনাট্যের চোখ এবং এর নাম করণে তিরিশ দশকের কলম। বলতে পারি, বিষয় এবং আঙ্গিকের এমন চমকপ্রদ সমাহার রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গল্পে আমি দেখিনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *তেলেনাপোতা আবিষ্কার*

এই যে আমরা এতকাল এত গল্প পড়েছি, ঢাকনা খুলে একবার আমরা দেখি না কেন একটি সংস্থান, যে, লেখক তাঁর গল্পটিকে কোন কালে দেখছেন? তিনি কি এমনভাবে দেখছেন, যে গল্পটি এইমাত্র ঘটে গেছে, এই কিছুক্ষণ আগে, এবং লিখছেন? অথবা, অনেক আগে? কিংবা, এই মুহূর্তে তাঁর চোখের ওপর সব ঘটেছে এবং তিনি বয়ান করে চলেছেন তাঁর গল্প? বা, তিনি এভাবেই কি দেখেন তাঁর গল্পটি, যে এই গল্প আগেও ঘটেছিল, এখন ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে?

লেখক কিভাবে দেখছেন তাঁর গল্পটিকে, কোন কালে, তার সংকেত পাওয়া যাবে গল্পে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের কালরূপটিতে। বাংলা ছাড়া অপর যে ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে, সেই ইংরেজি ভাষায় দেখতে পাই গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ রূপই প্রযুক্ত হয়, সাধারণ অতীত রূপ—হি সেড, শি লাফড, দে ওয়েন্ট; এর ব্যতিক্রম যে ওদের ভেতরে নেই, তা নয়—আছে, তবে তা ষোলো আনাই পরীক্ষামূলক। ইংরেজি ভাষায় একজন গল্পলেখকের হাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়াপদ তার সাধারণ অতীত রূপটি নিয়ে ধরা দেয়, এতেই তাঁর কাজ চমৎকার চলে যায়; গল্পটিকে তিনি কালের কোন পর্যায়ে ঘটতে দেখছেন সেটা আমাদের অনুমান করে নিতে হয় ভেতরের অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে।
কিন্তু বাংলা ভাষার লেখকের বেলায় পরিস্থিতিটা অন্য রকম। একটু আগে ইংরেজি গল্পে দেখছি এই রূপ- হি সেড, শি লাফড, দে ওয়েন্ট; বাংলা ভাষায় যখন লিখছি, অনিবার্য ভাবেই কি লিখছি— সে বলল, সে হাসল, তারা গেল?
না। একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখব, যে, বাঙালী লেখকের হাতে এ ছাড়াও ক্রিয়াপদের আরো অন্তত দুটি রূপ আছে যা তিনি ব্যবহার করতে পারেন; যেমন, সে বলেছিল, সে হেসেছিল, তারা গিয়েছিল, এবং, সে বলে, সে হাসে, তারা যায়। আর এই রূপটিও তো আছে লেখকের হাতে, যে, সে বলেছে, সে হেসেছে, তারা গিয়েছে।
অর্থাৎ বাংলা ভাষায় একজন গল্পলেখকের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রিয়াপদের একাধিক রূপ যা তিনি কাজে লাগাতে পারেন -বলে—বলেছে-বলেছিল-বলল, হাসে-হেসেছে—হেসেছিল-হাসল, যায়-গিয়েছে-গিয়েছিল-গেল। এবং ক্রিয়াপদের এই রূপগুলোর যে কোনো একটিকে তিনি মূল রূপ হিসেবে ধরে নিয়ে গল্প নির্মাণ করতে পারেন। তাঁর গল্পটিকে তিনি কালের কোন দূরত্বে দেখছেন, এখন অথবা তখন কিংবা সারাক্ষণ— গল্পের সেই ঘটে যাবার কালের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্রিয়াপদের বিশেষ এবং

একটি রূপ নির্বাচন।
গল্প থেকে লেখকের এই কালিক দূরত্ব, যার নির্ধারক লেখক স্বয়ং, এখন আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়, কারণ, আর কিছুক্ষণের ভেতরেই আমরা দেখব, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি গল্পে ক্রিয়াপদের এমন এক রূপ প্রয়োগ করেছেন যা গল্প লেখার ইতিহাসে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব—বাংলা ভাষায় তো বটেই, ইংরেজিতেও এর তুল্য প্রযুক্তি আমি দেখিনি; আমার বলতে লোভ হয়, গোটা বিশ্ব সাহিত্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' নির্মাণ কৌশললের দিক থেকে অনন্য, শ্রদ্ধেয় এবং পথিকৃৎ এক রচনা।
তবে, 'তেলেনপোতা আবিষ্কার'—এর আগে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব এবং বাংলা গল্পে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ কিভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা জেনে নিয়ে তৈরী হবো আবিষ্কারের জন্যে; প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকেই উদাহরণগুলো নেবো।
সে বলে-করে-হাসে-গায়-নাচে—— -'পুন্ন' গল্প থেকে।
'অসুখ আর কিছুতেই সারে না।
কাসি সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে—তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে তো চলেইছে। প্যাঁকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাশে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে—সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো। শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।
সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক-এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে বলে, 'মর না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।'

সে বলেছে-করেছে-হেসেছে-গেয়েছে-নেচেছে—'মহানগর' থেকে।
'এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেল দিদিকে ধরে। তারা হয়ত দিদিকে মারছে, হয়ত দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়ত রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। এ কথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।
বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন, 'কান্না কেন বাবা?'
চুপি চপি রতন বলেছে, 'দিদি যে আসছে না বাবা!'
মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে, 'আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে।'
রতন আর বেশি কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড়ো ভয় হয়েছে।
তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা সাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূরদেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে।'

সে বলেছিল-করেছিল-হেসেছিল-গেয়েছিল-নেচেছিল—'কলকাতার আরব্য রজনী' থেকে।

'এই বকবকানিতে নীলাম্বরের বিরক্তির বদলে একটু মজাই লেগেছিল এবার।
কতকটা ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলেছিল, 'তুমি সব জানো, না? একেবারে সব হাঁড়ির খবর।'
চোখটা অন্ধকারে সয়ে আসায় লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারা আরেকটু স্পষ্ট দেখতে পেয়েই তুমি বলে সম্বোধন করতে পেরেছিল নীলাম্বর। চেহারা পোশাক আখখুটে ইতর গোছেরই। মুখটা ভালো দেখা না যাওয়ায় বয়সটা অবশ্য বোঝা যায় নি।
লোকটা নীলাম্বরের ভর্ৎসনায় একটু শুধু হেসেছিল। সহিষ্ণুতার হাসি যেন। বলেছিল, 'আমি জানব না তো জানবে কে, স্যার। এই শহরের হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর কি আমি না জানি।'
নীলাম্বরের এবার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল লোকটা পাগল-টাগল হবে। তবে ভয় করবার কিছু নেই। নীলাম্বর গায়ে দস্তুরমত ক্ষমতা রাখে, টেরা-বাঁকা হলে অমন একটা ফড়িংকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে! আপাতত রিকশা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়টা পাগলের সঙ্গে কাটাতে মন্দ লাগছিল না।
নীলাম্বর একটু বিদ্রুপ করেই বলেছিল, 'নাড়ির খবর হাঁড়ির খবর কি করে এত জানলে।'

সে বলল-করল-হাসল-গাইল-নাচল—'ভবিষ্যতের ভার' থেকে।
'টিকে বেশ ধরে উঠেছিল; প্রস্তুত কলকেটি হুঁকোর মাথায় হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেন্ড পণ্ডিত মশাই বললেন, 'নিন মশাই।'
বললাম, 'মাপ করবেন।'
হেড পণ্ডিত মশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বললেন, 'তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান তো। ওগুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে—তা জানেন? সদ্য ওই মেম মাগীদের থুতু....।'
ঘৃণায় এক ধাবড়া থুতু পণ্ডিত মশাই ঘরের দেয়ালেই ফেললেন। তারপর হুঁকোর খোলটি ডান হাতে কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,'পায়েস ছেড়ে আমানি।'
যে চারটি গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো—'পুন্নাম', 'মহানগর', 'কলকাতার আরব্য রজনী' ও ভবিষ্যতের ভার', এর সব কটিরই লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, এবং এই যে তিনি একেকটি গল্পে ক্রিয়াপদের একেকটি বিশেষ রূপ প্রয়োগ করেছেন এর দায়িত্বও সম্পূর্ণ তাঁরই। ইংরেজী ভাষার একজন লেখকের মতো, যদি জিজ্ঞাসিত হন, তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন না এই বলে, যে, ক্রিয়াপদের কোন রূপ গল্পে প্রযুক্ত হবে তা ঐতিহ্য বা রেওয়াজ হিসেবে আমি পেয়েছি এবং কাজে লাগিয়েছি। গল্পের জন্যে বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের যে চারটি রূপ আমরা হাতের কাছে সারাক্ষণ পাই, প্রেমেন্দ্র মিত্রর আগেও লেখকরা রূপগুলো তাঁদের গল্পে ব্যবহার করেছেন, তাঁর পরের লেখকরাও করেছেন; তাই বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব বহন করতে হয় ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপটি সচেতনভাবে নির্বাচন করে নেবার ব্যাপারে; সচেতনভাবে, কারণ, ক্রিয়াপদই হচ্ছে বাক্যের বাক্য হয়ে ওঠার হেতু। এটা তো বলবার

অপেক্ষা রাখে না যে, ক্রিয়াপদের রূপ বাক্যের মাত্রা রচনা করে; তাই 'সে করে' এবং 'সে করেছিল' এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বাক্য, একটির সঙ্গে আরেকটির বিনিময় চলে না। যদি মনে হয়, আমি এমন একটি প্রসঙ্গ তুলেছি যা শিশুতেও বোঝে, অর্থাৎ 'সে করে' এবং 'সে করেছিল' এ দুই যে ভিন্ন অর্থদ্যোতক —এ আমার না বললেও চলত, তাহলে এখন বলি, যে এই সোজা ব্যাপারটাই কিন্তু বাঙালী লেখকের গল্প লেখাটিকে কিঞ্চিৎ অধিক জটিলতা দান করেছে। যেহেতু 'সে করে' এবং 'সে করেছিল' এ দুই ভিন্ন মাত্রার বাক্য, তাই লেখককে গল্প লেখার আগেই খুব হিসেব করে ঠিক করে নিতে হয়, ক্রিয়াপদের কোন রূপটি তিনি ব্যবহার করবেন তাঁর এই বিশেষ গল্পটির জন্যে। ক্রিয়াপদের রূপ যেহেতু সম্পূর্ণ কালনির্ভর, তাই লেখককে ভেবে নিতে হয় গল্পটিকে তিনি কোন কালিক দূরত্বে দেখছেন। দেখছেন অথবা দেখেছেন? দেখেন কিংবা দেখেছিলেন? এবং এই যে বিশেষ একটি রূপ বেছে নেবার ব্যাপার, এ কেবল কালিক দূরত্ব ঠিক করে নেয়ার ওপরেই নির্ভর করছে তাও নয়, বরং আমার মনে হয়, গল্পটির প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং এ গল্পের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে ওঠা, এ সবেরও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
'পুন্নাম' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের বলে-করে-হাসে-গায় রূপটি ব্যবহার করেছেন; আমরা একটু কান পেতে শুনি না কেন, ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি কোন ভাবের দিকে আমাদের ডাকছে? বলে, করে, হাসে, গায়, আসে, যায়, পড়ে...যেনবা এই ক্রিয়াগুলোর শুরু নেই, শেষ নেই, বৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে ঘটে চলেছে, হয়ে চলেছে, বারবার, আবার, আরো একবার, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ঘিরে, বিরামহীন। তাই নয় কি? 'পুন্নাম' গল্পটিকেও প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছেন বারবার অভিনীত হয়েছে, হয় ও হবে এমন একটি ইতিহাস হিসেবে। এক দম্পতির শিশু পুত্র অসুস্থ, তাকে ভালো করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তরুণ দম্পতি। স্বামীটির 'মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি'। ডাক্তার ছেলেটিকে নিয়ে হাওয়া বদল করতে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গতি কোথায়? ললিত অর্থাৎ স্বামীটি রাতে বিছানায় স্ত্রীর 'পেছন ফিরে শুয়ে মনে-মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।' অসুস্থ ও অর্থাভাবে পিষ্ট এই বাড়িটির কলতলায় বুনো কি একটা গাছে নামহীন গন্ধহীন ফুল ফুটেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন, 'ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।' আর তার পরেই তিনি লিখেছেন ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ, যা আমাদের সংকেত দেয় -কেন লেখক এ গল্পের জন্যে নির্বাচন করেছেন ক্রিয়াপদের করে-হাসে-বলে রূপটি। —'এই ছোটো সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হতে আবার নতুন দিনে। — মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আমানুষিক কৃচ্ছসাধনার অসামান্য আত্মবলিদানের কাহিনীর ধারা।'

এই ধারাটিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আরো বানান করে উচ্চারণ করেন গল্পের শেষ দিকে, যখন হাওয়া বদলের জায়গায় নতুন একটি শিশুর সঙ্গে আমাদের অসুস্থ শিশুটির বন্ধুত্ব হয়, আমাদের অসুস্থ শিশুটি ভালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ স্থানীয় অপর শিশুটি অসুস্থ হয়ে

পড়ে ও মারা যায়, দূর থেকে কান্নার রোল ভেসে আসে। 'ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে —বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃতস্বরে বললে, 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল— আশ্চর্য নয় ছবি?'

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু করে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে বলে যেতে লাগল, 'আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি।'—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, 'তোমরা মাথা খারাপ হয়েছে।'

লক্ষ্য না করে পারব না, যে, এই শেষ দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের করে-বলে-কাঁদে রূপটি ব্যবহার না করে করল-বলল-কাঁদল রূপটি প্রয়োগ করেছেন। যেনবা তিনি বিশাল থেকে ক্ষুদ্রে এসে প্রবেশ করলেন, মাঠ থেকে ঘরে, সমষ্টি থেকে ব্যক্তিতে—বিশেষ এই ব্যক্তিটির করোটিতে, যার স্বার্থপরতা দেখে তারই স্ত্রী বলতে বাধ্য হচ্ছে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি এই শেষভাগেও ক্রিয়াপদের আগের রূপটি প্রয়োগ করে যেতেন তাহলে আমাদের মনে যে ভাবটি তিনি গ্রহণ করতে বলতেন, তা হলো, এই স্বার্থপরতাই সত্য এবং চিরকালের। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর বক্তব্য তা নয় এবং তা যে নয়, তার প্রমাণ গল্পের শেষে এসে তাঁর ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন করা।

'মহানগর' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রিয়াপদের দুটি রূপ ব্যবহার করেছেন, বলেছে-করেছে-গিয়েছে এবং বলে-করে-গিয়ে। দেখাই যাক না, এই দুই রূপ কিভাবে কখন কোন ভাবনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্ণয় করে নিয়েছেন।

'আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদশিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।' লেখকের দুটি হাত যতদূর প্রসারিত হয় ততদূর প্রসারিত করে এই যে আমাদের ডাক দিলেন, অচিরেই তিনি কিন্তু বলছেন, 'আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি— মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ।' কিন্তু হাত গুটিয়ে আনতে চাইলেই তো চট করে পারা যায় না, মাপ ছোট করতে চাইলেই কি সহজে তা করা যায়; তাই বিশাল মহানগরের এক অংশে একটি মাত্র চরিত্র নিয়ে গল্প যখন শুরু করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনি একেবারেই হঠাৎ সেই বিশেষ পরিবেশের সমান্তরালে নিজেকে স্থাপিত করতে পারলেন না, করলে সেটা মসৃণ ও স্বাভাবিক হতো না; তাই চরিত্র বা ঘটনার পাশাপাশি হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না, তিনি একটু ওপর থেকেই দেখতে লাগলেন সব কিছু— 'জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকো, মাঝিরা বড়ো নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে, এখন তারা ছই-এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি করে গিয়ে বসেছে রতন তা কেউ জানে না—সেই বুঝি রাত না পোহাতেই।' আমরা লক্ষ্য না করে পারি না ক্রিয়াপদের চলেছে-বসেছে রূপটি।

'রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল

পেয়েছে।' আমরা অনুভব করে উঠি বিশাল থেকে বিশেষে এই যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন লেখক, এর জন্যে ক্রিয়াপদের এই রূপটি কত জরুরী ছিল। তারপর নৌকো যখন মহানগরের ঘাটে এসে লাগল, ক্রিয়াপদ হয়ে গেল করে-বলে-ওঠে। 'মুকুন্দদাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে, 'তুই নামলি যে বড়।'

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে, 'আচ্ছা, কোথাও যাস নি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা।'

আমরা অচিরেই জানব যে রতন তার দিদিকে মনে মনে এই মহানগরে খোঁজে। আমরা অস্পষ্টভাবে আরো জানতে পারব যে, রতনের দিদিকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছে; আমাদের অনুমান হবে, রতনের দিদি এই মহানগরে বেশ্যা পল্লীতে হয়ত আছে, হয়ত তাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেই গুণ্ডারা; কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়, বরং আমাদের চেয়ে রতনের ধারণা অনেক বেশি স্পষ্ট, সে বিশ্বাস করে এই মহানগরেই তার দিদি আছে। দিদির কথা সে আগে বহুবার বাবাকে শুধিয়েছে, লেখক তখন ক্রিয়াপদের করেছে-বলেছে রূপটির সাহায্য নিয়েছেন।

রতন এখন বাবার চোখ এড়িয়ে মহানগরে বেরিয়ে পড়ে এবং ভাগ্যচক্রে এক বেশ্যা পল্লীতেই সে প্রবেশ করে; সেখানে এক বেশ্যা রমণীই তাকে নিয়ে যায় চপলা নামে এক যুবতীর কাছে। রতনের দিদির নাম ছিল চপলা। যুবতী রতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে। 'এদিক ওদিক চেয়ে ধরা গলায় বলে, 'তুই একা এসেছিস?' ভাইবোনে এভাবেই মহানগরে দেখা হয়। লক্ষ্য করব, গল্পের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে গিয়ে আমি ব্যবহার করেছি ধরে-বলে-পড়ে-যায়; প্রেমেন্দ্র মিত্র মূল গল্পেও তাই-ই করেছেন—'রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।' ক্রিয়াপদের এই রূপটি না ব্যবহার করে যদি লিখতেন, 'রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে রইল, কিছু বলল না।' তাহলে কি রচিত হতো, রক্ষিত হতো, ভাগ্যতাড়িত অসহায় দুটি ভাইবোনের বিচ্ছেদ ও আকস্মিক সাক্ষাতের এই স্পন্দিত বেদনাটুকু?

গল্পের শেষে আমরা দেখছি, রতন দিদির কাছে থাকতে চায়, কিন্তু দিদি তাকে রাখবে কি করে? দিদি তাকে জোর করে বিদায় দেয়। রতন হেঁটে যায় বড় রাস্তা পর্যন্ত। 'চপলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।' রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে, 'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।'

বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গী পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। 'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।'

গল্পটি এখানেই শেষ; শেষ হয়েও যে শেষ হয় না; রতন যে আমাদের কানে বারবারই বলে যেতে থাকে, 'আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি, কারুর কথা শুনব না।' এবং বারবার যে মহানগরের ওপর বিস্মৃতির মতো গাঢ় অন্ধকার নামে, আমরা যে বুকের ভেতরে তোলপাড় নিয়ে অনুভব করে উঠি— শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতিই সত্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে-সময়ের বহমানতার সংকেত সেই-সময় আমাদের সব কিছু একদিন ভুলিয়ে দেয়, রতনও একদিন ভুলে যাবে তার দিদির কথা, দিদিকে দেয়া তার প্রতিজ্ঞার কথা; এই বেদনা ও

এই সত্য, এ কেবল ক্রিয়াপদের ঐ করে-বলে-আসে যায় রূপটির ভেতর দিয়েই আমাদের বুকের ভেতরে অবিরাম এখন ঢেউ ভাঙ্গে; যতদিন এ গল্প আমাদের মনে পড়বে, এভাবেই এ ঢেউ এসে আমাদের পাড়ে আঘাত করবে—এখানেই ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটির যাদু।

'কলকাতার আরব্য রজনী' গল্পে আমরা দেখছি ক্রিয়াপদের মূল রূপটি হচ্ছে করেছিল-বলেছিল-হেসেছিল-গেয়েছিল। একটি ছোট্ট পরীক্ষা করা যাক; এই যে ক্রিয়াপদ চারটি আমি এখন বলেছি, যদি এ চারটি শব্দ খুব দ্রুত উচ্চারণ করে যাই, লক্ষ করব, এক ধরনের চটুলতা ফুটে উঠছে, যেনবা কারো পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয়া হয়েছে; আবার ঐ শব্দ চারটিই যদি টেনে টেনে উচ্চারণ করি, কি আশ্চর্য, আমরা দেখতে পাবো, রচিত হচ্ছে কম্পমান এক বিষাদ। এবার আমার ধারণাটির কথা বলা যায়, এবং আমার ধারণা হচ্ছে, ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটির ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একই সঙ্গে চটুলতা ও বিষন্নতা; এবং একে খুব ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এই গল্পটিতে।

নামেই রয়েছে সংকেত—'কলকাতার আরব্য রজনী', তার নীচে আবার উপশিরোনাম 'গয়লা চোরের কেচ্ছা'; আমরা ঘন হয়ে উঠি মজাদার কিছু শোনবার জন্যে, কারণ, একে আরব্য রজনী, তায় কেচ্ছা—কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর মেতো লেখক কেবল মজাদার 'কেচ্ছা' শোনাতে কলম ধরবেন, ভাবা যায় না; অতএব এর ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু কথা আছে, আছে মানব জীবন সম্পর্কে কোনো আবিষ্কার, কোনো পর্যবেক্ষণ। অতঃপর গল্পটি পাঠ করে উঠে আমরা অনুভব করি, কেচ্ছা তো বটেই, সেটা মোড়ক মাত্র, ছিঁড়ে ফেলবার বস্তু, এ গল্পের ভেতরে রয়েছে মানুষ সম্পর্কে লেখকের এই পর্যবেক্ষণ, যে, মানুষ গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবার জন্যেই প্রস্তুত, প্রেম ভালোবাসাও মানুষকে মানুষ হিসেবে ধরে রাখতে পারে না, মানুষ কেবলই নষ্ট হয়ে যেতে চায়, নষ্ট হয়ে যায়।

গল্পটি এই যে, এক তরুণ দম্পতি, বড় গরীব তারা—'চৌকাঠ পেরিয়ে কদিনই বা সংসারে ঢুকেছে, কিন্তু এরই মধ্যে হালে পানি না পেয়ে ফেঁসে গেছে পাথুরে ডুবো ডাঙায়।' এখন তারা শেষ কড়ি খরচ করে 'শেষ বাসর সাজিয়েছে, ফুল বিনে এসেন্স আতর ছড়িয়ে।' অতঃপর তারা আত্মহত্যা করবে। এদিকে ঐ রাতেই এক চোর চুরি করে ফেরার পথে গোপন এই দম্পতির কথা শোনে, চোখে দ্যাখে, তারপর করুণায় সে তার চুরি করা বেশ কিছু টাকা দম্পতিটির জন্যে রেখে যায়। সেই টাকায় তাদের দারিদ্র্য ঘোচে, তারা আবার জীবনের স্বাদ ফিরে পায়; আর, চোরটি—তার নাম বেচারাম, 'বেচারামের সেই এক নেশা লাগল, স্যার। ভগবান হওয়ার নেশা, পঞ্চ রংয়ের চেয়ে কড়া। কিছুদিন অন্তর অন্তর বেশ কিছু লুকিয়ে সেখানে ঢেলে আসে।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পটি বলেছেন মাঝরাতে পার্কে রহস্যময় বাউন্ডুলে এক ব্যক্তির জবানীতে এবং স্বয়ং তিনি যেন শুনছেন; কেচ্ছার মোড়কটা এখানেই। গল্পের শেষদিকে এসে সে বলছে, 'ঘর-দোর পাল্টেছিল, শেষে পাল্টাল মানুষ।' একদিন চোর বেচারাম এসে দ্যাখে, রাত দুপুরে সিঁড়ির কাছে মেয়েটি বসে আছে; একা; তারপর—'রাত দেড়টার সময় ছোকরা এলো, স্যার। বুঝতেই পারছেন, মদ খেয়ে এসেছে কোন হুরীর ঘর থেকে কে জানে। দুজনে তারপরে কি চিল্লামিল্লি চুলোচুলি। নেহাৎ দুপুর রাত বলে কাক চিল ওড়েনি। মেয়েটি বলে, 'মানতাসার জন্যে টাকা রেখেছিলাম, তুমি তাই চুরি করে গিয়ে ফূর্তি করেছ।

ছেলেটা বলে, 'বেশ করেছি। মানতাসা গড়াবে। গয়নার লালচ আর মেটে না।'

চোর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যেত এদের সংসার, আজ এই যা সে দেখল তাতে তার ভগবান সাজবার নেশা ছুটে গেল। অন্য বাড়িতে চুরি করে ফিরছিল সে, ঝুলির ভেতরে ছিল টাকা পয়সা সোনার গয়না; সে আজ গোপনে এদের বাসায় রেখে গেল কিছু গয়না। আমাদের মনে হতে পারে, চোর বেচারাম বুঝি আরো একবার করুণার উথলে উঠে সাহায্য করে গেল ওদের; কিংবা, পুরুষটির ওপর তার রাগ হয়েছে, তাই সে স্ত্রীটির জন্যে রেখে গেছে গয়না, যা নিয়ে আজ রাতের এই কলহ। চোর এ গল্প বলেছিল পার্কের সেই লোকটিকে যার নাম নীলাম্বর, আর নীলাম্বর এখন বলছে লেখককে, এই দু'হাত ফেরা গল্পের এখানে এসে যেমন আমরা, তেমনি নীলাম্বর এবং লেখক, সকলেই উদগ্রীব হয়ে উঠি—অতঃপর?

'তারপর? জিজ্ঞাসা না করে পারে নি নীলাম্বর। তারপর আর বেশি কিছু নেই, স্যার। ছোকরার জেল হল চোরাই গয়না বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে'। আমাদের সন্দেহ থাকে না, বেচারাম ঐ পুরুষটিকে শাস্তি দেবার জন্যেই চোরাই গয়না রেখে গিয়েছিল, সাহায্য করবার জন্যে নয়।

গল্পটি যখন ঘটেছে আর গল্পটি আমরা যখন জানতে পারছি—সময়ের দূরত্ব এ দুয়ের ভেতরে কম বেশি যাই থাক না কেন, লক্ষ করতে হবে এর বক্তা স্বয়ং চোরের মুখে বর্ণিত ঘটনার শ্রোতা, এবং শুনবার পর, কত পরে আমরা জানি না, সে বলছে লেখককে এবং তিনি বলছেন আমাদের। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বাক্যের ভেতরে বাক্স থেকে পায়রা বের করবার কৌশলটি অবলম্বন করেছেন 'আরব্য রজনী' ও 'কেচ্ছা'র মেজাজ আনবার জন্যে; আর তাকে যে ক্রিয়াপদের করেছিল-খেয়েছিল-বলেছিল-হেসেছিল রূপটি ব্যবহার করতে হয়েছে, সেটা শ্রুত ঘটনা বিবৃত করার কারণে যতটা, ততটাই চটুলতা ও বিষন্নতাকে একই সঙ্গে ধরে দেখাবার প্ররোচনায়।

ক্রিয়াপদের বলল-করল-হাসল-গাইল রূপটি 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পের শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ করব ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি আমরা প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি। ক্রিয়াপদের এই রূপটির কাজই হচ্ছে কাজের কথাটি সরাসরি হাজির করা; এবং এই রূপটির রেখে যাওয়া ঢেউ হচ্ছে, ঐ যা ঘটে গেল তার রেশ এখনো রয়েছে, এখনো সেটা ফুরিয়ে যায় নি। 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন এক তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যে হেড মাস্টারির চাকরি পাবার পর স্ত্রীকে বলছে, 'মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর, তা জানো? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর আছে?' এই গল্পের ভেতরে অতঃপর যত অগ্রসর হবো, দেখতে থাকব—কিভাবে তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে, বাধা তাকে কাবু করছে, এবং শেষে একদিন সে নিজেই আবিষ্কার করতে পারছে, যে, যে-শিক্ষক ও শিক্ষাদান রীতিকে সে ঘৃণা করত, সে নিজেই কবে সেই শিক্ষকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

'স্কুলের শেষ দুটো ঘন্টায় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, 'কিছুদিন রেস্ট নিন না—আপনিই সেরে যাবে।'

বলি, 'হ্যাঁ, এইবার নেবো ভাবছি -আচ্ছা এর কোনো ওষুধ টষুধ দেয়া চলে না তো?'

'কিছু না। শুধু বিশ্রাম নিলে আপনি সেরে যাবে।'
ক্লাসে শেষ দু'ঘন্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।
আর সত্যিই মাঝে মাঝে লিখতে দেওয়া তো আর খারাপ নয়। লেখাটাও তো দরকার।
আমি তো আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না– লেখার ভেতর দিয়েও তো ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়।–ভেবেচিন্তে লেখার একটা খেলাও তো বার করা যেতে পারে।
ছেলেদের বলি, 'কে কোন অক্ষর নিবি বল।'
'এফ, স্যার' 'আর'—'সি'—
'বেশ। আজকের পড়া থেকে নিজের নিজের অক্ষর যে কটা কথার আগে আছে খুঁজে খুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগ্যে কটা অক্ষর পড়ে।'
বেশি করে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। ক'দিন ধরেই তারা এ খেলা করছে—জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার।'
এই তো বেশ লেখার পদ্ধতি। ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভালো মতলবই বেরিয়েছে।
একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, 'আমার ওয়াই ছিল, স্যার, হয়ে গেছে।'
'আচ্ছা এবার 'ই' ধরো—'
কী বোঝে জানি না; কেউ খাতা নিয়ে আসে না।
হঠাৎ ঘন্টার শব্দে জেগে উঠি।
চমকে দেখি—
ঘুমচ্ছিলাম—
টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলাম।'
প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এই গল্পের শুরুতে ক্রিয়াপদের যে বলল-করল-হাসল-গাইল রূপটি ব্যবহার করেছেন তা আমাদের একটানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই স্কুলটিতে যেখানে আমাদের তরুণ শিক্ষকটি নতুন কাজ নিয়ে এসেছে। তারপর যখন দরকার হলো এই চাকুরি নেবার পূর্বকথা জানাবার—ক্রিয়াপদ হয়ে গেল করে-বলে-হাসে-গায় এবং এই রূপটিই ধরে লিখিত হলো গল্পের শেষ দীর্ঘ পর্বটি। শিক্ষকটি যে ক্রমশ তার স্বপ্ন, সাহস ও মেরুদণ্ড হারাচ্ছে, এই যে শেষ পর্যন্ত হয়, মানুষ এভাবেই যে একদিন পতিত হয়—এই ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটিকে লেখক বেছে নেন।
ক্রিয়াপদের যে চারটি রূপের কথা এতক্ষণ বলা হলো, বাঙ্গালি গল্প লেখকের হাতে এই রূপগুলো ছাড়াও অন্য কোনো রূপ আছে কিনা, আমি অনুমান করি, সম্ভবত এ রকম কোনো ভাবনা প্রেমেন্দ্র মিত্রর মনে একদা এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলা ভাষায় এখন পর্যন্ত যে সামান্য কয়েকজন প্রধান গল্প লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি তার ভেতর প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্যই একজন; এবং আমার বিবেচনায় তিনি বুধগণের মধ্যেও উজ্জ্বলতম, কারণ কালোত্তীর্ণ গল্প রচনাই তিনি করেছেন কেবল তা নয়, তিনি গল্পের নির্মাণ কৌশল নিয়েও কালোত্তীর্ণ পরীক্ষা করেছেন, সম্পূর্ণ নতুন একটি দরোজা খুলে দিয়েছেন, আর সেটি তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে।
সে বলবে, সে হাসবে, তারা যাবে—ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটি যে গল্প বলবার কাজে লাগতে পারে, এ আমরা ধারণা করিনি; প্রতিদিনের ব্যবহারে ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটির

ভূমিকা, আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি, আমাদের ধারণার চেয়েও ব্যাপক; আমরা অনেক কথাই ভবিষ্যৎ ছাড়া জ্ঞাপন করতে পারি না, যদিও এ সবের বক্তব্যে ভবিষ্যতের ভূমিকা এমন কিছুই নয়, যেমন—এখন খাবো, এবার ঘুমোব, চিঠি লিখব, আসবে তো কখন আসবে, কি বলব দুঃখের কথা; আমার সন্দেহ হয়, কাউকে যদি বলা হয় ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগ না করে এক বেলা সংসারে ওঠাবসা করতে, সে পারবে না, বাজি হারবে। প্রতিদিনের জীবনে আমরা গল্প করবার কালেও ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটি বেশ ব্যবহার করি, যদিও বর্ণিত গল্পের সবটাই ঘটে গেছে অতীতে। যেমন, মনে করা যাক, পূর্বে কেউ দুর্ঘটনায় পড়েছে, সেই গল্প বলা হচ্ছে, বলতে বলতে আহত ব্যক্তিটির পথ চলার অন্যমনস্কতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়— তুমি দেখবে ও হাঁটছে, তোমারই পাশে পাশে, তুমি ডাকবে, তোমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফিরে তাকাবে না, যত হাত নাড়ো দেখতেই পাবে না।
কিন্তু গল্প বলার লৌকিক এই ভঙ্গীটি আমরা সাহিত্যে কখনো ব্যবহার করেছি বলে আমার মনে পড়ে না; সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগ করে রচনা তো দূরের কথা; পরীক্ষাটি অপেক্ষা করছিল একজন প্রেমেন্দ্র মিত্রর জন্যে।
এবং যে কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও জানেন, যে, ক্রিয়াপদের এই ভবিষ্যৎ রূপটি পাঠকের অভ্যেসকে ক্ষুন্ন করবে, চমকিত করবে, গল্পের চেয়েও কৌশল বড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে—এবং আমরা জানি, রচনার চেয়ে রচনার কৌশল যখন বড় হয়ে দাঁড়ায়—তখন সেটা শিল্প না হয়ে খেলায় পরিণত হয়; অতএব তিনি এমনভাবে অগ্রসর হন গল্পটিকে নিয়ে যেন আমরা বুঝতে না পারি ভেতরে ভেতরে কতখানি চমকপ্রদ তাঁর কলা কৌশলটি।
প্রথমত, গল্পের নামই আমাদের উন্মুখ করে সমুখের জন্যে ঐ 'আবিষ্কার' শব্দটি সংকেত দেয়– কোনো কিছু আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে—হ্যাঁ, ভবিষ্যতে; এবং আমরা পাঠক হিসেবে গল্পের ভেতরে কেবল নয় ভবিষ্যতের বলয়ে প্রবেশ করে যাই শিরোনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর, খুব মৃদু কণ্ঠে, কিছুটা ইতঃস্তত করে—এবং সবই লেখকের ইচ্ছাকৃত ভান, ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপটির ভেতরে আমাদের ডেকে নেবার কৌশল এ, প্রেমেন্দ্র মিত্র শুরু করেন তাঁর গল্প এ ভাবে—
'শনি ও মঙ্গলের—মঙ্গলই হবে বোধ হয়—যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন।'
এখানে, গল্পের এই প্রথম অনুচ্ছেদে, ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ ব্যবহার করা হয় নি, তবে যে রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রায় ভবিষ্যৎসূচক—যদি যান তবে আবিষ্কার করতে পারেন, যেন একটি পরামর্শ, কেবল একটি নির্দোষ প্ররোচনা মাত্র। এই প্রথম অনুচ্ছেদে লোভও দেখানো হচ্ছে, যে, তেলেনাপোতায় গেলে মাছ ধরবার ভারী সুবিধে আছে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখক আপনার অনেক কিছুই স্থির বলে ধরে নিয়েছেন, যেমন, আপনি মাছ ধরতে ভালোবাসেন, আপনি আপিস থেকে দু'দিন ছুটি পেয়ে গেছেন এবং এখন আপনি তেলেনাপোতায় যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। তাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুরু হচ্ছে দুম করে এ ভাবে—

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধূলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘন্টাদুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা।'

লক্ষ্য না করে পারি না, লেখক এই দীর্ঘ বাক্যে যাত্রার যে কষ্টের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা আমাদের সাবধান বা পিছপা করবার জন্যে কেবল নয়, কিছু পরিমানে আড়াল করে রাখবার জন্যেও বটে, যে, এখান থেকেই তিনি আমাদের ক্রমাগত এখন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলছেন। এই প্রথম ক্রিয়াপদ পেয়েছে ভবিষ্যৎ রূপ—এবং এখনো পরামর্শ ও পথ-সংকেতের সূত্রেই এই ভবিষ্যৎ রূপটি প্রযুক্ত হয়ে চলেছে, কিন্তু অচিরেই ফেরার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার, কারণ—'একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।' এবং আপনার পেছনের জগত, আপনার চেনা জগত, আপনার সমগ্র বাস্তব সেই কুণ্ডলিত জলীয় বাষ্পের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে।

লেখক ধরেই নিয়েছেন, আপনি এখন তেলেনাপোতার পথিক; এবং তিনি এখন এই বাষ্প কুণ্ডলের সাহায্যে আপনাকে এতটাই বাস্তব থেকে বিযুক্ত করে ফেলেছেন, যে, তিনি যা বলছেন তাইই আপনি মেনে নিচ্ছেন। গল্পে এই প্রথম, পথে বেরিয়ে এতটা এগোবার পর, আপনি জানতে পেলেন—আপনি একা নন, আপনার সঙ্গে আরো দু'জন বন্ধু আছেন, তারাও আপনারই সঙ্গে একই পথের পথিক।

লেখক আপনার ওপর এতটাই অধিকার এখন আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন, যে, রীতিমতো তিনি আপনাকে হুকুম করছেন। তেলেনাপোতায় পৌঁছে আপনি একটা ভাঙা দালানের সমুখে নেমেছেন, লেখকের নির্দেশ—'এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।' আর এখানে আপনি রাতে দেখতে পাবেন দূরের একটি জানালায় কোনো রমণীয় ছায়া এবং পরদিন মাছ ধরতে বসে দেখা পাবেন এক যুবতীর যে 'কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন যে? টান দিন।' আর আপনি সেই মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে এসে জানতে পারবেন, আপনার সঙ্গে যে দু'জন বন্ধু আছেন তাদেরই একজন এই মেয়েটির আত্মীয়। এ খবরটিও লেখক আপনাকে আচমকা দিয়েছেন, আগে দেবার দরকার বোধ করেননি; আমরা বাইরে থেকে অবাক হয়ে লক্ষ করি, কিভাবে পাঠকের ওপরে লেখক তাঁর নিয়ন্ত্রণ এটাই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন, যে তিনি যা বলছেন, যেভাবে বলছেন, সেটাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে—এবং অসহায়ভাবে নয়, লেখকেরই সহযোগী হিসেবে।

এবার গল্পটি সংক্ষেপে বলে নেয়া যায়। পুরনো এই দালানে থাকে যামিনী নামে এক যুবতী এবং তার অন্ধ মা –আর কোনো জনমানবের সাড়া নেই। দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে যামিনীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন তার মা, নিরঞ্জন নামে সেই বোনপো কথা দিয়েছিল যে বিয়ে করবে, কিন্তু সেটা ছিল বুড়ির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে একটা কথার কথা, নিরঞ্জন চিরদিনের মতো পালিয়ে যায়, বুড়ি এখনো অপেক্ষা করে আছে—নিরঞ্জন আসবে, এলে তার হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজবে। নিরঞ্জন কখনোই আর আসে না, যামিনীর বিয়ে হয় না, যামিনী মেনে নিয়েছে তার আইবুড়ো

জীবন, মা এখনো চেয়ে আছেন পথ, পায়ের শব্দ পেলেই তিনি চমকে ওঠেন—ঐ বুঝি নিরঞ্জন এলো। এই গল্পটিকে একদিক থেকে বলা যায় –স্থির একটি চিত্র, বিবর্ণ একটি ফটোগ্রাফ; মা ও মেয়ে—বিধ্বস্ত অট্টালিকা পটভূমিতে, চারদিকে এগিয়ে আসছে অরণ্য, আলোর চেয়ে অন্ধকারই এখানে প্রবল।

কোনো গল্প কিভাবে বলবেন লেখক, সে সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার, সিদ্ধান্ত তাঁরই—এ নিয়ে প্রশ্ন চলে না; একই গল্প একেক লেখকের কলমে একেক রকম হয়ে ধরা দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাঁর এ গল্পটি পড়বার পর সিদ্ধান্ত করতে পারি, স্থির করেন দুটি বিষয়—এক, মা ও মেয়ের এই স্থির জীবন আর কখনোই পরিবর্তিত হবে না; দুই. নিরঞ্জন ছাড়া জগতে আর কারো সাধ্য নেই, সম্ভবত সেই নিরঞ্জনেরও আর এখন ক্ষমতা নেই, এই স্থির চিত্রে জীবন সঞ্চার করতে পারে—বরং সে চেষ্টায় নষ্ট ভ্রষ্ট হতে হবে নিজেকেই; করুণা যদি করি এক মুহূর্তের জন্যে তো প্রতিশোধ নেবে স্বয়ং প্রকৃতি।

এবং তাইই হয়। যামিনীর এই ইতিহাস শুনে আপনি বীরত্ব অথবা করুণা দেখিয়ে তার অন্ধ মায়ের সমুখে নিরঞ্জন সেজেছিলেন; তিনি যখন বলেছিলেন, 'এবার তো আর অমন করে পালাবি না?' তখন আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

'বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা? তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তেলেনাপোতা আবিষ্কারে এসে এ আপনি কোন মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন? বন্ধনের চিহ্ন হিসেবে আপনি আপনার ছিপখানা ফেলে এলেন তেলেনাপোতায়, যে, আবার ফিরে আসবেন, এবং যামিনীর কাছে। কিন্তু ঐ যে বলেছি, প্রকৃতি নেবে শোধ –প্রকৃতির কাছে কোনো ভাবালুতার অবকাশ নেই, আপনাকে ধরবে ম্যালেরিয়া, বহুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকবেন, আর ফিরে যাওয়া হবে না কোনদিন সেই তেলেনপোতায় কিংবা যামিনীর কাছে—কারণ, 'অস্ত যাওয়া তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে, তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদুর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো খুব বড় মাপের একজন লেখকই পারেন, শেষ পর্যন্ত গল্পের প্রাথমিক অনুমানটিও নিঃশেষে গুঁড়িয়ে দিয়ে, যে, তেলেনাপোতা বলে সত্যি সত্যি কিছু নেই, এবং তারপরও আমাদের কাছে দাবী করতে, যে, আমরা জীবনের একটি নির্মম সত্যের নিষ্করুণ উচ্চারণের সম্মুখে বিস্ময়ে, বেদনায়, সীমাবদ্ধতার ক্ষোভে একবার ভেঙ্গে পড়ব এবং আরেকবার স্নান করে উঠে দাঁড়াব 'তবে তাই হোক বলে।'

তাঁর এই দাবীর পেছনে জোর এনে দিয়েছিল ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ রূপ প্রয়োগের মতো তুলনারহিত পরীক্ষাটি।

জগদীশ গুপ্তর *দিবসের শেষে*

আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই আমার মনে পড়ে যায় জগদীশ গুপ্ত নামে বাংলা ভাষার একজন লেখক ও তাঁর 'দিবসের শেষে' এই ছোট গল্পটির কথা; এবং আজই আমি গল্পটি পড়ে ফেলি; —এই ঘটনার ভেতরে, মনে হতে পারে আছে, কিন্তু, কোন আকস্মিকতা নেই। কিছুটা আকস্মিকতা এসে যেতে পারত যদি 'দিবসের শেষে' আজই আমার হাতে অমনি এসে ধরা দিত, যেমন কখনো হয়—কোনো লেখার কথা ভাবছি আর লাইব্রেরীতে হাজার খানার ভীড়ে সেই লেখাটিই হাতে উঠে এলো; কিন্তু, আমি খুব খুঁজে পেতেই আজ বের করেছি জগদীশ গুপ্তর বই এবং ভোরে মনে পড়ে যাওয়া গল্পটি হাতে নিয়েছি আরো একবার।

আরো একবার? সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, আমার লেখক জীবনের শুরুর দিকে, একবার এই গল্পটি মনে নেই কোথায় পড়ে ভীত স্তম্ভিত হয়ে, আর একে কিছুতেই মাথা থেকে নামাতে না পেরে, কেবলি পায়ে পায়ে অবিরাম রমনার মাঠ ভেঙে এবং গল্পটি নিয়ে ভেবে এবং এর বক্তব্য নিয়ে ভেবে এবং এর নির্মাণ নিয়ে ভেবে, এর কলকব্জা যাবতীয় আঁত অংশ অংশ খুলে ফেলে, বিছিয়ে দিয়ে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, তবে নিস্তার পাই এর হাতে থেকে; তারপর, এই আবার, আজ, গল্পটি আমি পড়লাম। তা না হয় হলো; তবে এই, জগদীশ গুপ্তর কথা হঠাৎ একটি ভোরে, যখন শীত কেবল পড়তে শুরু করেছে, যখন বছরের ভেতরে ঘুম এই কেবল সুশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, আর গত রাতেই আমার একটি বড় লেখার শেষ পংক্তিটি লেখা হয়ে গেছে এবং যখন শেষ রাত থেকে মাঠের শেফালি গাছ দুটি টুপটাপ করে ফুল দিয়ে চলেছে, মনে পড়ে যাওয়া, এই বিশেষ লেখকটিকে, সূর্যোদয়ের মতো চেতনার জলতল ভেদ করে, আকস্মিক নয় কি?—না, আকস্মিক একেও আমি বলব না; কারণ, আমি লিখি এবং অন্য লেখক ও তাঁদের লেখা আমার বিদ্যালয়, অতএব জগদীশ গুপ্তর কথা যে কোনো সময়েই আমার মনে আসতে পারে। আমার মনে এসেছিল বলেই যে আজই আমাকে ঐ বিশেষ গল্পটি খুঁজে এনে পড়তে হবে, পড়তেই হবে— অনিবার্য নয়, অনিবার্য ছিল না; কিন্তু আমি পড়েছি বটে।

আকস্মিক—এর অর্থ কি তবে? কারণহীন কোনো ঘটনা? যুক্তিহীন কোনো আবির্ভাব? সূত্রহীন কোনো পরিণতি? কিছু এমন, অপ্রত্যাশিত? কিছু এমন, অগাধীয়? অথবা, আমরা এই শব্দটিকে প্রতিদিন ব্যবহার করি এর ব্যাস বেধ না জেনেই, প্রায় জনশ্রুতি হিসেবে পাওয়া একটি আওয়াজ হিসেবে?

আর, অনিবার্য— ওটাই বা কি? সাধারণ আমাদের জীবনে আমরা অনবরত ব্যবহার করি 'অনিবার্য'-সমূহের দীর্ঘ একটি তালিকা —দিন গেলে রাত আসবে, জল নিচের দিকে গড়াবে, দু'য়ে দু'য়ে চার হবে এবং আরো কত, আরো কত অনেক; আমরা এই সাধারণেরাই আমাদের জীবন যাপনের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, যে, অনিবার্যের চেয়ে অনিশ্চয়তাই বরং প্রবল এ পৃথিবীতে।

আমি এখন আপনাদের ঠেলে দিয়েছি দুটি শব্দের দিকে, আকস্মিক এবং অনিবার্য; এর একটি উদ্দেশ্য আছে; জগদীশ গুপ্তর এই গল্প, 'দিবসের শেষে', যা আমাদের ঘুম হরণ করে, আমাদের স্বস্তিতে চিড় ধরায় এবং পায়ের তলার মাটি দুলিয়ে দেয়, এর ভেতরে বিপজ্জনকভাবে পুরে দেয়া আছে ঐ শব্দ দুটির প্রচণ্ড বিস্ফোরক।

সত্যিই, বিস্ফোরকের মতোই হাজার হাত দূরে সরিয়ে রাখেন একজন গল্প-লেখক জীবনে যা কিছু অনিবার্য এবং যা কিছু আকস্মিক। তিনি এমন কিছুই ঘটাতে পারেন না যার প্রস্তুতি নেই, তিনি এমন পথে পা রাখতে পারেন না যে পথে যাবার কথা আমাদের জানা।

জীবনে অকস্মাৎ কত কিছু হয়, গল্পে অকস্মাৎ কিছু হতে নেই; এ এক মজার ব্যাপার, জীবন যা সবল ও সাবলীলভাবে ঘটিয়ে দিতে পারে, লেখকের সাধ্য কি তা পারে? পারে না যে তার কারণটি বড় সরল— জীবন এক সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা, গল্প সম্পাদিত একটি নির্মাণ। জীবন বহে যায়; ঘটে যায়, এগিয়ে যায়, ব্যক্তির মৃত্যু, বা যুগের অবসান জীবনের ধারা স্তম্ভিত করতে পারে না; লেখক এই বহমান ধারা থেকে কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন, এবং সচেতনভাবে তিনি এই সংগ্রহ করেন, তাঁকে অনবরত মর-চোখে যুক্তির অন্তর্গত হয়ে থাকতে হয়, তাঁর এই সংগ্রহ করবার হাতটিকে চালনা করে জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শন ও বক্তব্য, এবং শেষ পর্যন্ত এই বক্তব্যই তাঁর সংগৃহিত অংশগুলোকে অর্থবহ বিন্যাসে রক্ষা করে।

তবে, আকস্মিকতা যদি বর্জন করেন লেখক, তিনি কি আলিংগন করেন অনিবার্যতাকে? হায়, এমন যদি হতো, তবে কত সরল হতো গল্প নির্মাণ। কিন্তু মানুষ সংখ্যায় নয়, মানুষের জীবন গনিতের অংক নয়, এবং প্রতিটি মানুষ হন প্রতি ভিন্ন এক ব্যক্তি; তাই, অনিবার্যতা মানুষের জীবনে অনিবার্য কোনো উপাদান নয়, রচিত গল্পে তো নয়ই। রচিত গল্পে অনিবার্যতা বরং প্রধান এক দুর্বলতা এবং তা এই কারণে যে, যা হবেই হবে তার ভেতরে মানুষের স্বাধীন কোনো ভূমিকা নেই। গল্প তখনই গল্প হয় যখন গল্পের চরিত্রগুলোর স্বাধীনতা থাকে সিদ্ধান্ত নেবার অথবা নিজের না থাকলেও যখন সে উপলব্ধি করতে পারে সেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে কোথাও না কোথাও কারো না কারো ভেতরে।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর এই গল্পে—'দিবসের শেষে'— একজন লেখকের পক্ষে অবশ্যমান্য এই দুই নিষেধ উপেক্ষা করেছেন; গল্পটিকে তিনি সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়েছেন আকস্মিকতা ও অনিবার্যতার ওপর, যেনবা এ গল্পের পদচারণার জন্যে এই দুটি পা তিনি নির্বাচন করেছেন। এবং তারপরও তিনি রচনা করতে পেরেছেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ একটি ছোটগল্প।

গল্পটি একবার বলে নেয়া যায়।

'রতির একটি মাত্র ছেলে নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচু গোপালের মাদুলি ধারণ করে— তারপর পেটে আসে এই পাঁচু।' এই পাঁচুই গল্পের শুরুতে একদিন ঘুম ভেঙে উঠে মাকে বলে, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।' শুনে চমকে ওঠে নারাণী, স্বামীকে অবিলম্বে সে জানায় ছেলের এই সর্বনাশা কথা। রতি তৎক্ষনাৎ ছেলেকে শাসন করে বলে, 'খবরদার, ফের যদি ও কথা মুখে আনবি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।' পাঁচু আজ আর নদীতে স্নান করতে রাজী নয়। দুপুর বেলা রতি বাড়ি ফিরে ছেলেকে নিয়ে নদীতেই স্নান করতে যেতে চায়, কারন তার কথায়, 'ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বলুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতজন হাসলেন।' হাসবার কারণ, বাড়ির পাশে এই কামদা নদীতে কস্মিনকালে কেউ কুমির দেখেনি; আর ছেলের যে ভুলটা রতি ভাঙাতে চায়, তা হলো— ছেলেমানুষ একটা কথা বললেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না।

পাঁচুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে রতির অবশ্য হঠাৎ ভয় হয়। 'নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে।' রতি সাবধান হয়েই পাঁচুকে স্নান করায়, বাড়ি এসে হাসতে হাসতে ছেলেকে ঈষৎ ঠাট্টা করে বলে, 'কেমন কুমিরে নেয়নি তো?' ছেলেও হাসে, মাও হাসে; মা বলে, 'ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

সেদিন বিকেলেই ছোট্ট একটি অঘটন ঘটে। চুরি করে কাঁঠাল খেতে গিয়ে পাঁচু ধরা পড়ে গায়ে রস, কাদা, আঠা সমেত; মা চেঁচামেচি করে ওঠে, বাবা রাগ করে ছেলের হাত ধরে নদীর দিকে রওয়ানা হয় পরিস্কার করাবার জন্যে।

জগদীশ গুপ্ত লিখছেন, 'পাঁচুর হাতে খেলার একটি ঘট ছিলো— সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে আগে নদীর দিকে চলিলো। রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দুর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা, আমার ঘট?'

উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিলো, 'নিয়ে আসি বাবা?'

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো। মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে নিশ্চল। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো। সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।'

তারপর আর একটি মাত্র লাইন, দুটি ছোট ছোট বাক্য, গল্প শেষ —'কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।' আমরাও স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বইয়ের পাতা বন্ধ করতে ভুলে যাই; আমাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ হয় এই ভেবে, যে, শিশুটিকে বাঁচাবার এমন কোনো উপায়ও আমরা জানি না যে লেখককে বলব, অনুগ্রহ করে আপনি তার প্রাণ রক্ষা করুন এই রন্ধ্রপথে।

গল্পের সূচনাতে আছে পাঁচ বছর বয়সী পাঁচুর একটি উক্তি, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে'—লেখকের ভাষায় 'তাহা যেমন ভয়ংকর, তেমনি অবিশ্বাস্য', কিন্তু তার চেয়েও বড়, উক্তিটি আকস্মিক। গল্পের শেষে এই উক্তিটিই সত্যি হয়ে যায়, অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন সত্যি সত্যি কামদা নদীর জল ভেদ করে কুমির ওঠে, যা কেউ কখনো শোনেনি, এবং পাঁচুকে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলে যায়। সমস্ত গল্পটি ঘটে যায় অনিবার্যভাবে; পাঁচুর কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হবার পরমুহূর্ত থেকে ভবিষ্যতবাণীটি ফলে যাবার দিকে অগ্রসর হয় দ্রুত গতিতে; প্রতিটি বাক্য, বর্ণনা, অণুঘটনা, সবই পাঁচুকে নির্মম ও নিশ্চিতভাবে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে কুমিরের দিকে: তারপর যখন পাঁচুকে নিয়ে জলের ভেতরে তলিয়ে যায় কুমির—আমরাও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে অনুভব করে উঠি, যে, 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়—যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি প্রাকৃতরূপ।'

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এক বস্তু, আর তাকে শিল্পে চালিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ আরেক বস্তু। জগদীশ গুপ্ত নিয়তির এই নিষ্ঠুরতা, মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'দৈব-নির্যাতন', শিল্পে অনুবাদ করতে গিয়ে মৌলিক একটি কৌশল স্থির করে নেন; সেটি হচ্ছে, যেহেতু তিনি পাঁচুর মুখের একটি আকস্মিক উক্তি দিয়ে গল্প শুরু করবেন, এবং সেই আকস্মিক উক্তিটিকেই শেষ পর্যন্ত সত্যি করে দেবেন, বস্তুত, যেহেতু এই একটি আকস্মিক উক্তিই এ গল্পের হয়ে ওঠার কারণ, তাই তিনি সারা গল্পে কোথাও কোনো আকস্মিকতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। অচিরেই আমরা লক্ষ করব, কি ভাবে তিনি প্রতিটি বর্ণনা ও অনুঘটনার আভাস বহু আগে থেকেই দিয়ে যেতে থাকেন যাতে কোনো কিছুই আকস্মিক, উড়ে আসা বা ভাসমান বলে বোধ না হয়; বস্তুত পক্ষে গল্পটি দ্বিতীয়বার পড়বার কালে আমরা আবিষ্কার করব কি আশ্চর্য উদ্ভাবন এই লেখকের, যে, এতবড় 'অনিবার্য' যা কেবল জীবনে সম্ভব, গল্পে নয়, সেই 'অনিবার্য'টিকে মর্মান্তিক রকমে অনিবার্য করে পাঠকের মাথায় ধ্বস নামিয়ে দেবার জন্যে তিনি এই সরল কৌশলটি অবলম্বন করেছেন, যে, কোন কিছুই আগে বলা ভিন্ন পরে আমদানী করা হবে না; আর তবেই একটি আকস্মিক উক্তি এত অনিবার্যভাবে সত্যি হয়ে যাবে এবং আমরা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নেবো।

আর এ গল্প লেখার আগে, খুব হিসেব করে, একটি সুরও তিনি স্থির করে নিয়েছেন; যেখানেই পারবেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করবেন— নিয়তিকে, যে, তোমার দুষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তো তুমি হিসেব করে সব সাজিয়ে নিয়েছিলে বহু আগেই; কিন্তু এই ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তুলিতে, প্রায় বোঝা যাবে কি যাবে না, দ্বিতীয় পাঠেও হয়ত ধরা পড়বে

না, তৃতীয় বা চতুর্থ পাঠের প্রয়োজন হতে পারে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, প্রথম পাঠেই যদি আবিষ্কৃত না হলো, তাহলে সে কৌশল প্রয়োগের মূল্য কোথায়? মূল্য এইখানে, যে, যেমন, ঘড়ির ভেতরে কত সূক্ষ্ম দাঁত, চাকা, তার, কুণ্ডল— আমাদের না জানলেও চলে, কিন্তু ঐসবের উপস্থিতি বিনা ঘড়ি মোটেই সময় দিত না।

দেখা যাক, জগদীশ গুপ্ত কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন পাঁচুর এই গল্পটি নিয়ে। গল্পের প্রথম বাক্য—'রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার— বাড়ির পূর্বে নদী, কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শষ্যক্ষেত্র।' লক্ষ্য করব প্রথম এই বাক্যেই লেখকের মূল কৌশল ও সুর, দুটোই উপস্থিত। পাঁচু নদীতে গিয়ে কুমিরের মুখে পড়বে; পাছে আমরা প্রশ্ন করি ইঁদারা থাকতে, পুকুর থাকতে নদীতেই কেন যাবে পাঁচুকে নিয়ে তার বাবা, তাই গল্পের বিন্দুমাত্র আভাস দেবার আগেই আমাদের তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন, যে, বাড়ির নিকটতম জল-উৎস হচ্ছে কামদা নদী। আর বঙ্গটিও আমরা লক্ষ করতে পারব নিয়তির প্রতি লেখকের ছুঁড়ে দেয়া এই বিশেষণটিতে, যে, চমৎকার—'রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার।' কেন চমৎকার? কার জন্যে চমৎকার? আর কারো জন্যে নয়, নিয়তিরই জন্যে, কারণ নদীর পাড়ে বাড়ি বলেই পাঁচুকে নিয়ে স্নান করতে রতি যাবে নদীতে; এটা নিয়তিরই পাতা একটি জাল। গল্পের দ্বিতীয় বাক্যটি দীর্ঘ এবং দেখুন— 'সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে— গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ শির শির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না; কিন্তু এই এত বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃকপাতও নাই— তার চোখ কান এ সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই।' এই যে সূর্যদেবের কথা বলা হয়েছে, এটাও এক বড় রকমের আভাস দিয়ে রাখা; সূর্যকে দেবতা রূপে শুরুতেই চিহ্নিত করাটা গভীরভাবে পরিকল্পিত, কারণ, গল্পের শেষে, পাঁচু যখন কুমিরের মুখে, লেখক লিখবেন, 'পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো— সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।' এখানে সূর্যকে আর দেবতা বলা হয়নি, বলবার দরকারও নেই, কারণ আগেই আমাদের লেখক সূর্যকে দেবতা বলে সনাক্ত করেছেন, এখন মনে মনে যুক্ত হলো দেবতার একটি বিশেষণ-রক্তপায়ী; সেই দেবতাকেই কুমির নিবেদন করছে তার মুখের আহার—পাঁচু যেনবা দেবতার প্রসাদ পাচ্ছে সে। এই দ্বিতীয় বাক্যে ব্যঙ্গের সুরটিও লেখক চিত্র বাজিয়ে দিয়েছেন— প্রকৃতির এক প্রশান্ত সুশীল চিত্র তিনি এঁকেছেন এবং শেষে যে বলছেন, রতির 'চোখ-কান এ সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই', এ যেন তিনি বলতে চাইছেন, এ সব মন ভোলানো কবি প্রসিদ্ধিমাত্র, রতি না জেনেছে ভালোই হয়েছে, আজ বিকেলেই তো সে দেখবে প্রকৃতির তথা নিয়তি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর রূপটি। রতির চোখেই যে কেবল সত্য দর্শনের সুযোগ পাবে, লেখক সেই কথাটিই যেন জানাতে চান পরের বাক্যের এই অংশটিতে —'রতি বস্তুতান্ত্রিক।'

চতুর্থ বাক্য দেখুন এবং লক্ষ করুন লেখক কিভাবে প্রতিটি বিষয়ের পূর্বাভাস বা বীজ রেখে যাচ্ছেন—'একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইতো না;

এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।' অর্থাৎ শাদা কাথায়, পশ্চিমে যাদব দাসের বাগান থেকে রতি নাপিত আম-কাঁঠাল চুরি করে থাকে। এই সার কথার ভেতরে আমরা লেখকের বিশেষ কৌশলটি অবলোকন করতে পারছি। প্রথমত, গল্পের শেষ ভাগে পাঁচু ধরা পড়বে চুরি করে কাঁঠাল খেতে গিয়ে এবং তার মা কাঁঠাল চুরি সম্পর্কে বাঁকা কথা বললে রতির সেটা আঁতে গিয়ে লাগবে, কারণ, গোড়াতেই কাঁঠাল চুরি করে সে, অতএব এখন নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে অহেতুক ক্ষিপ্ত হয়ে পাঁচুকে সে টান মেরে নিয়ে যাবে নদীতে গা ধোয়াতে, আর সেখানেই কুমির তাকে নেবে; এই কাঁঠাল চুরিও পাছে সাজানো বা আকস্মিক মনে হয়, তাই লেখক শুরুতেই কাঁঠালের বাগান ও চুরির কথা তুলে রাখলেন। দ্বিতীয়ত, সেই যে নিয়তির প্রতি ব্যঙ্গ —এখানেও লেখক রতিকে সরাসরি আম-কাঁঠাল চোর না বলে বাঁকা ইশারা দিয়েছেন এই ভাবটি আনতে, যে, দ্যাখো, নিয়তির এও এক ফাঁদ, রতি কাঁঠাল চুরি না করলে পাঁচুও গা নোংরা করত না, নদীর ঘাটে যাবারও প্রয়োজন হতো না, কুমিরও তাকে নিতো না।

গল্পের দুটি অনুচ্ছেদ লিখে ফেলেছেন জগদীশ গুপ্ত, এখনো গতি সঞ্চার করেননি, এখনো তিনি ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে চলেছেন; গতিটি আনবেন তিনি চতুর্থ অনুচ্ছেদে, তার আগে তৃতীয় অনুচ্ছেদে নিয়তির নিষ্ঠুরতা ও অশুভ ছায়ার সংকেত দিচ্ছেন তিনি এভাবে একটি বাক্যে—'রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব গৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে—তারপর পেটে আসে পাঁচু।' গল্পটি পুরো পড়বার পর ফিরে এসে এই বাক্যটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, পাঁচুগোপাল নামে দেবতাটি আরো কঠিন রকমে নিষ্ঠুর, কারণ তার নামে মাদুলি ধারণ করে যে পুত্রের মা হয় নারাণী, সেই পুত্রটিকে প্রসব গৃহ থেকেই নদী গর্ভে নেননি তিনি, পাঁচ বছর মায়ের কোলে রেখে, মায়ের স্নেহের ভরা পূর্ণিমায় পাঁচুকে ভিজিয়ে তবে তার প্রাণ হরণ করেছেন, সম্ভবত কুমিরের ছদ্মবেশে। অতঃপর চতুর্থ অনুচ্ছেদে পাঁচু ঘোষণা করল, আজই তাকে কুমিরে নেবে; রতি তাকে কঠোর শাসন করল কুকথা মুখে আনবার জন্যে; আর এখান থেকেই লেখক শুরু করলেন নতুন এক চাল; অতঃপর আমাদের একবার তিনি আশ্বস্ত আরেকবার উৎকণ্ঠিত করতে লাগলেন— যেন এই বিশেষ চালের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধৈর্য-অসহিষ্ণুতা, অমল-কুটিল এ সবের ব্যবধান ভেঙে দিতে তিনি এখন উদ্যত। ছেলের মুখে কুমিরে নেবার আগাম কথা শুনে রতি যদি বিচলিত হয়ে থাকে, পরের অনুচ্ছেদেই লেখক আশ্বস্ত করছেন এই বলে, 'তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ— নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছলছল শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পংকিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী, কামদা, তার দুই তীর আর জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষুসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী— চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লী-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।'

বেশ; ভয় নাই। রতিও দুপুরে বাড়ি ফিরে পাঁচুর অহেতুক ভয় ভাঙাবার জন্যে নিয়ে

এসেছে তাকে নদীর তীরে; কামদা নদী। রতি হঠাৎ দেখল, 'নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে— এতো বড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরাবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই।' আমরা গোড়াতেই দেখেছি, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি রতির পক্ষপাতিত্ব নেই, তবুও সাধারণ মানুষের মতো নদীকে সেও মায়ের মতো জেনে এসেছে তার সুপেয় শীতল জলের জন্যে, সেই নদীকে আজ প্রথম তার ভয় করে ওঠে। আমরা লক্ষ করব, এ গল্প যদিও সাধুভাষায় রচিত, এর আর কোথাও এতগুলো তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই— এবং এ ভাবে, একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্যে, আমরা একটু স্থির হয়ে তাকালেই দেখতে পাবো, এই পরিস্থিতি প্রকৃতির নয়, রতির মনোভাবের; ওপরের উদ্ধৃতি আরেকবার পড়লেই আমরা আবিষ্কার করতে পারব, যে শব্দগুলো লেখক ব্যবহার করেছেন তা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে আসা শব্দ। কিন্তু এই ভয়টিকে তিনি, জগদীশ গুপ্ত, পাঁচুর শুশুক দেখে ভয় পাওয়ার মতো ছেলেমানুষি দিয়ে কাটিয়ে দিলেন, বাপ ছেলে দুজনকেই হাসিয়ে দিলেন, তিন পুত্র বিনাশের পর চতুর্থ পুত্র পাঁচুকে নিয়ে সদ্য শংকিত যে-মা নারাণী, যে 'কুমিরে নেবে' শুনে কাঁটা হয়ে আছে, তাকেও তিনি টান টান দড়ির ওপর থেকে নামিয়ে আনলেন।

'রতি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে হাসিতে বলিলো, 'না।'

নারাণী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

লেখক না লিখলেও আমরা অনুভব করি, স্পষ্ট দেখতে পাই— উত্তেজনা আমাদেরও আর নেই; সকলি শিথিল ও কোমল বলে বোধ হচ্ছে এখন, প্রায় যেন ঘুম পাচ্ছে, আমরা যেন ভুলেই গেছি পাঁচুর সেই ভোরবেলার ছেলেমানুষি আচমকা একটা কথার কথা, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

কথাটা যে ভুলে গেছি , বা প্রায় ভুলে গেছি— লেখকের এটি উদ্দেশ্যমূলক একটি বিভ্রম রচনা; কারন, এরপরেই যখন গল্প, সামান্য বিরতির পর, আবার শুরু হবে, আমাদের বুঝে উঠতে বিলম্ব হবে, যে, গল্প এখন কোনদিকে যাচ্ছে; এই বিলম্ব হওয়াটা পুরো লাভ দেবে অচিরেই, কারণ, অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা যে আঘাতটি শেষে পাব তার ওজন দশগুণ হয়ে তবেই তো দেখা দেবে।

শেষ ভাগে গল্প যায় কাঁঠাল চুরি করে ধরা পড়া পাঁচুর দিকে; গায়ে তার ধুলো, রস, আঠা; অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সে কাঁঠাল খাচ্ছিল, তার বাবা মা ছিল দিবানিদ্রায়, এই সুযোগে; সঙ্গীরা পালিয়ে যায়, ধরা পড়ে একা পাঁচু ।

'পাঁচু মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেলো— এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে'— আমাদেরও এখন ঈষৎ স্মরণ হয় সেই ত্রাস ছিল কুমিরে তাকে নিয়ে

যাবার ত্রাস; আমরা এখন পাঁচুর সঙ্গে, পাঁচুর মায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই— ছেলেটা তবে খামোকাই ভয় পাচ্ছিল, আমাদেরও জ্বালাতন করে রেখেছিল; তারপর, লেখক লিখেছেন, 'কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলো। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা, তেমনি তার— হয়েছে কি?' পল্লীর এ বড়ো পরিচিত একটি দৃশ্য, গৃহস্বামীর এ বড়ো পরিচিত একটি হুঙ্কার; আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই, যে, সেই কুমির বিষয়ে আর কিছুই উত্থাপিত হবে না। গল্প এগোয়, যেমন চিরকাল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এ ঝগড়া যে পথে এগোয়, 'নারাণী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি করে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো।' —বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।' এই ব্যঙ্গ, আমরা অচিরেই দেখব, আমাদের বিভ্রান্ত করবারই কৌশল বটে, এবং নিয়তির প্রতি শেষ বিদ্রূপ, যে, এই কাঁঠালের জন্যেই পাঁচুকে শেষ পর্যন্ত নদীর কাছে যেতে হবে, তুমিই এর নাট্যকার। 'রতি ভ্রুঙ্গী করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা হলে তো হবে?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।' আসলে রতি স্ত্রীর মুখোমুখি নিজের কাঁঠাল চুরি করার প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে হলেও দেখতে চায় না, দ্রুত সে ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে যায়, তার পরের উদ্ধৃতি একটু আগেই আমি দিয়েছি, ঐ উদ্ধৃতিতেই গল্প শেষ হয়।

এবং গল্প শেষ হয় একটি সংক্ষিপ্ত জোরালো ধাক্কায়—অন্য গল্পের মতো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নয়, অথবা কোনো মন্তব্যে নয়, চরিত্রের কোনো অন্তর্গত ভাবনা দিয়ে নয়; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি কোণ থেকে নিরাসক্ত কলমে আঁকা একটি অবিস্মরণীয় চিত্র দিয়ে; রক্তের বর্ণে অঙ্কিত সেই চিত্র, সূর্যাস্তের বর্ণ, অস্তায়মান সূর্যের বিশাল গোলকের পটভূমিতে ক্ষণকালের জন্যে স্থির— কুমিরের মুখে পাঁচু, পর মুহূর্তে কুমির অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু তখনো আমাদের বিভ্রম ও আঁখিতারায় স্থাপিত হয়ে থাকে ঐ চিত্রটি— এখন, অনেকক্ষণ ও সর্বক্ষণের জন্যে। রচনার এই অসামান্য কৌশলের কারণেই এ গল্প আকস্মিকতা ও অনিবার্যতাকে ব্যবহার করেও বাংলা সাহিত্যের প্রধান একটি গল্প হতে পেরেছে বলে আমি মনে করি; সামান্য অমনোযোগে যে গল্প আষাঢ়ে গল্প হয়ে যেতে পারত, কারিগরি উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগে সেই গল্পই মানুষের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে নিদ্রাহর একটি রচনা হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ংকর

মনে হতেই পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলো পড়ে, যে, এ সবই তাঁর কলমে এসে গিয়েছিল বড় অনায়াসে; তাঁর ভঙ্গী বড় সরল, ভাষা সহজ; তিনি গল্প শুরু করেন খুব সাধারণভাবে, কথা বলেন নিচুস্বরে কোনো অধিকার দাবী না করে, ঘটনা থেকে ঘটনায় চলে যান অবলীলাক্রমে, এবং গল্প যখন শেষ করেন, যত চমকপ্রদই হোক সে পরিণতি— এ লেখকের বহু ছোট গল্পের শেষ আমাদের মূল ধরে আছাড় মারে— সে উপসংহার থেকে তিনি এতখানিই আপন দূরত্ব রক্ষা করেন, যে, মনে হয়, এ গল্প উদ্ভাবনে, এ জীবন পর্যবেক্ষণে এবং এ বিশেষ সত্য আবিষ্করণে তাঁর, একজন লেখকের, কোনো হাত ছিল না।

যেন জীবনের জল কলরব করতে করতে জটিল কুটিল ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে, বহমান সেই জীবন থেকে এক আঁজলা খপ করে তুলে ধরে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন, পর মুহূর্তে ঢেলে দিলেন জীবনস্রোতে, তৎক্ষণাৎ মিশে গেল ধাবমান জীবন প্রবাহে—বেমালুম; কিন্তু আমরা আর ভুলতে পারলাম না যা আমাদের দেখানো হলো। আমাদের অভিজ্ঞতা এই— মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প শেষ হয়ে যায় কিন্তু চরিত্রগুলোর সঞ্চরণ তখনো শেষ হয়ে যায় না; আমরা পরের গল্পে চলে যাই কিন্তু আগের গল্পটিকে পেছনে যে ফেলে আসতে পারি তা নয়; চরিত্রগুলো কখনোই আমাদের ত্যাগ করে না; আগের গল্পের মানুষজন পরের গল্পের আশেপাশেই ফেরে, আমরা একটু এ পাশ ও পাশ তাকালেই তাদের সাক্ষাত পেয়ে যেতে পারি। বলা যায়, হৃত হয় আমাদের নিদ্রা, লুপ্ত হয় আমাদের স্বস্তি, আয়নায় যদিবা আমাদের মুখ হয় প্রতিফলিত, সেখানে আর আবিষ্কার করতে পারি না নিরাপত্তা—এ সবই হয় এই লেখকের গল্প পড়ে, এই শাদামাঠা ভাষায় লেখা, আপাতদৃষ্টে কোনো কৌশল বিনাই নির্মিত— সরীসৃপ, প্রাগৈতেহাসিক, যে বাঁচায়, আজ কাল পরশুর গল্প, সমুদ্রের স্বাদ, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, কুষ্ঠরোগীর বৌ —যেমন মনে এলো কয়েকটি গল্পের নাম করলাম, কিম্বা এই 'ভয়ংকর' যা এখন আমাদের হাতে।

কৌশল বিনা?—অথবা এইই তাঁর কৌশল? সাহিত্যিক দূরে থাকুন, সাংবাদিক— যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছুনো যায় ততই যাঁর কৃতিত্ব, অতএব যিনি সরলতম প্রকাশের সাধক, সেই সাংবাদিকের চেয়েও, অনুমান করি, কম, অনেক কম শব্দভাণ্ডার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ; এটা নিশ্চয়ই তাঁর বিদ্যার অভাববশত নয়, তাঁর প্রবন্ধ আমার দেখেছি এবং তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং এ সব থেকে জেনে যাই, ইচ্ছে করলে ভাষাকে যেমন নতুনভাবে তিনি ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি শব্দভাণ্ডারও বাড়াতে পারেন। অতএব, বিশ্বাস করতে হয়, সরল এক বাগভঙ্গী তিনি

সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন; ভাষার সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এনেছেন কথকতার সারল্য—কোনো চমকপ্রদ কৌশল নয়, কালক্রম নিয়ে খেলা নয়, ইন্দ্রজাল রচনার চেষ্টা নয়, এমনকি অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে বাক্য পরম্পরার ভেতরে ছন্দ নির্মাণেরও আকাঙ্ক্ষা নয়, কিছুই নয়, কেবল বলে যাওয়া, গল্পটি বলে যাওয়া, এই হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম।

তাঁর গল্প পড়ে মনে হয়, যেনবা ইস্টিশানে, কি লঞ্চঘাটে, কি কাছারীর বারান্দায় অপেক্ষমান একটি সমাবেশ, সমুখে সুদীর্ঘ অপরাহ্ণ, সমাবেশটি বিদ্রোহী নয়, সহিষ্ণুও নয়, তবে নিশ্চিতভাবে উৎসুক বটে; এদেরই একজন, সে কথক বলে নয়, জীবনে কিছু দেখেছিল বলে সেই অধিকারে, প্রকৃতিদত্ত প্রাঞ্জলতার সঙ্গে বলে যাচ্ছে। মনে হয় প্রকৃতিদত্ত, কিন্তু বড় পরিশ্রম করে পাওয়া এই প্রাঞ্জলতা । শিল্প সৃষ্টির কোনো কৌশলই প্রকৃতিদত্ত নয়, রক্তবাহিত নয়, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয়; বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের একজন এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকক্ষ আর সকলের চেয়ে যে 'সরল' ও 'সাধারণ' —গল্প বলার এই ভঙ্গীটি তিনি খুব সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখার কারিগরি দিক সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখায় যাঁরা হঠাৎ দেখতে পান না, তাদের জন্যে সরাসরি তিনি বলেন, 'লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অংক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখা একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে।' অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, আপাতদৃষ্টে যাঁর লেখা সরল মনে হয়, কৌশলবর্জিত মনে হয়, নাগরিকদের সমাবেশে গ্রাম্য বলেও যাঁকে মনে হতে পারে, সেই তিনি লেখার হাত অর্জন করাকে দেখছেন অংক শেখার সমপর্যায়ে, একটি যন্ত্র বানাবার কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে তুলনা করে; খেলা ও গানের মতো ব্যাপারটাকে প্রতিদিনের রেওয়াজের বস্তু হিসেবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখতে গিয়ে সচেতনভাবে একটি বড় ব্যাপার করেছিলেন যার তুল্য উদারহরণ গোটা বাংলা সাহিত্যে আর চোখে পড়ে না— তাঁর আগেও না, তাঁর পরেও না। ব্যাপারটি হচ্ছে— একেকটি গুচ্ছ পরিকল্পনা করে তিনি গল্প লিখেছেন, একটি বিশেষ চিন্তাকে একাধিক গল্পে ধরবার চেষ্টা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এক আকুতি একাধিক জীবনের ভেতরে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, এক পর্যবেক্ষণকে বিভিন্ন কাল ও পাত্রে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। এই ব্যাপারটি বাংলা কবিতায় বহু কবির হাতে বহুবার এসেছে; মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কিম্বা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'র কথা আমাদের মনে পড়বে; মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'বনবাণী', 'মহুয়া' এবং আরো অনেক; আমরা দেখতে পাবো একটি বিশেষ সুর, একটি বিশেষ মনোভঙ্গী, একটি বিশেষ আর্তি, একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ কিভাবে এক গুচ্ছ কবিতায় কাজ করছে; আমরা লক্ষ্য করব, প্রতিটি কবিতাই স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ কবিতা, এবং এ সত্ত্বেও গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা অখণ্ড একটি রূপ নির্মাণ করছে, সব স্বতন্ত্র মিলে এক অনন্য সম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে উঠছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প রচনাতেও এই একই পরিকল্পনা ও প্রেরণা আমরা আবিষ্কার করি; তাঁর কিছু ছোটগল্পের বই হাতে নিলেই ব্যাপারটা আমাদের

চোখে ধরা পড়বে। 'বৌ' নামে গল্প সংকলন, এতে আছে কত রকমের বৌয়ের গল্প— দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ থেকে শুরু করে কুষ্ঠরোগীর বৌ পর্যন্ত; কিম্বা 'ভেজাল' এই বইটি—কত রকমের ভেজাল এই সংসারে, ভালোবাসায় ভেজাল, আশ্বাসে ভেজাল, বিশ্বাসে ভেজাল, জীবনযাপনে ভেজাল, এমনকি পিতৃত্বে ভেজাল— ভেজালের এ এক অনুপুঙ্খ মানচিত্র; 'সমুদ্রের স্বাদ' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি গল্পের বই, ভূমিকায় তিনি বলছেন, 'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে সমুদ্রের স্বাদের গল্পগুলি লেখা।'— স্পষ্ট টের পাওয়া যায়, একটা মূল সুর বা অবলোকন কি ভাবে এই লেখককে দিয়ে এক গুচ্ছ গল্প লিখিয়ে নিত। এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা সচেতন ছিলেন বোঝা যায় 'আজকাল পরশুর গল্প'-এর ভূমিকার এই অংশটি পড়ে— 'গল্পগুলি একটা বিশেষ ভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল যাতে আজকাল পরশুর গল্প নামটির সঙ্গতি হয়ত আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে—গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।' কোনো সন্দেহ আমাদের মনে থাকে না, যে, এই লেখক একটি সূত্র পরিকল্পনার ভেতরে গল্প উদ্ভাবন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং, 'এক বছরের মধ্যে লেখা' থেকে ধরণা পেয়ে যাই—কি ভাবে একটা সুর তাকে কিছুকাল অধিকার করে থাকত।

'ভেজাল' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প সংকলন আছে, একটু আগেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে; এ বইয়ের প্রথম গল্প 'ভয়ংকর'—জীবনের যেখানে যত ভেজাল এই লেখক দেখতে পেয়েছেন তার কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন তিনি এ বইয়ের এগারোটি গল্পে। আমরা দেখেছি মানিক বনেদ্যোপাধ্যায় একটি পর্যবেক্ষণ বা দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু গল্প লিখতেন এবং আমরা 'আজকাল পরশুর গল্প'র ভূমিকা থেকে এও জানতে পেরেছি, যে, তিনি গল্পগুলো সাজাবার ব্যাপারেও একটা যুক্তি প্রয়োগ করতেন, অর্থৎ তিনি বিশেষ পর্যবেক্ষণটির ক্রমবিকাশ দেখাতে চাইতেন গল্প পরম্পরার ভেতর দিয়ে; এ কথা মনে রেখে এখন বলতে পারি, যে, 'ভেজাল' বইটির প্রথম গল্প হিসেবে 'ভয়ংকর'কে যে তিনি নির্বাচন করেছেন এরও একটা অর্থ আছে। এই অর্থটি আমরা গল্প পড়বার পরেই কেবল আবিষ্কার করতে পারব।

গল্পের প্রধান চরিত্র প্রসাদ; লেখকের বর্ণনায়, 'প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালো মানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।'

এই ভূষণ হচ্ছে প্রসাদের মনিব। 'মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাস-বুনানি কদমকেশর চুল, ফোলাফোলা গাল, নাকের গহ্বর দুটি কাঁচাপাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে।'

ভূষণের স্ত্রী আশা। 'চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সব সময়ই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে

বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপটা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে।'

এই তিনটি চরিত্র এ গল্পে; তিনজনের ভেতরে আশার বর্ণনাই একটু বেশি জায়গা নিয়েছে, ফলে মনে হতে পারে আশার ভূমিকা এ গল্পে প্রধান; কিন্তু না; চতুর্থ আরেকটি চরিত্র আছে, প্রকৃতির সংসার থেকে সে এসেছে, লেখকের বর্ণনায় তার একটি কাজ—'চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ।' —হ্যাঁ , মানুষ নয়, রক্ত মাংসে নির্মিত কোনো প্রাণীও এ নয়, ঝড়, এ আমাদের পরিচিত কালবৈশাখী, প্রাকৃতিক একটি ঘটনা।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত রকমের— খাদ্যের জন্যে সে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তার সৌন্দর্য চেতনার আদি উৎস প্রকৃতি, তাকে বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর করায় প্রকৃতি, তার প্রথম বন্ধু প্রকৃতি, তার শেষ আশ্রয় প্রকৃতি; এবং প্রকৃতিরই বর্তমান দুর্ভাগ্য এই যে, আধুনিক লেখকের কাছে সে উপেক্ষিত, অপরীক্ষিত, অব্যবহৃত; সম্প্রতি এমন—যেন প্রকৃতিকে ব্যবহার করাটা অধুনিক মানস অনুমোদন করে না; যেনবা প্রকৃতিকে ব্যবহার করলে আমরা 'গ্রাম্য' বলে নিনন্দিত হই, সহজিয়া বলে ভর্ৎসিত হই—তাই প্রকৃতির দিকে আমরা আর তাকাই না।

'ভয়ংকর' গল্পটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে বড় মাপে কেবল ব্যবহার করেছেন তাইই নয়, তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন জীবন্ত মানুষের মতো একজন হিসেবে এবং এই 'একজন'ই গল্পের গল্প হয়ে ওঠার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, স্বয়ং সে রক্তমাংসে নির্মিত না হয়েও রক্তমাংসের মানুষকে আমূল বদলে দিচ্ছে। আমার ধারণা, বাংলা সাহিত্যে এ এক নজিরবিহীন গল্প যেখানে প্রকৃতিকে মানুষের সমান কি তার চেয়েও বড় একটি চরিত্র হিসেবে আমরা পাচ্ছি।

গল্পটি এই —

মস্ত চামড়া কারখানার মালিক ভূষণের চাকরি করে প্রসাদ, থাকে তার বাড়িতেই। ভূষণের বৌ আশা; তার সম্পর্কে প্রসাদের ভাবনা, 'দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে, সত্য সত্যই যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায়?'

আশা সম্পর্কে প্রসাদের ভয়ের কারণ—'মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। —রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরুলাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন।' কিন্তু সব ভন্ডুল করে দিল আশা। প্রসাদকে ডেকে সে ঠাট্টা করল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে? মাগো মা, কোথায় যাব।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার আত্মগোপনকারী কৌশল প্রয়োগ করে, প্রতারক সরল ভাষায়, নিচুস্বরে অতঃপর লিখছেন, 'তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হলো এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে

কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু। মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা-না-ভাবাকে।'

বিস্মিত না হয়ে পারি না; এই কথাগুলো আরেকবার পড়ে, থেমে থেমে পড়ে, আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই; প্রথমবারে যদিও বা বুঝতে পারিনি, এবার আর সংশয় থাকে না —বাঙালি ঘরের সাধারণ এক বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে কি ভয়ংকর চিত্র লেখক এখানে আঁকলেন এবং কি স্বাভাবিকভাবে, নীরবে, কোনো হৈ চৈ না করে তিনি খুলে দিলেন গোপনতম একটি দরোজা যার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিপাত মাত্র আমাদের মর্মমূল পর্যন্ত শিহরিত হয়ে গেল। আশা এবং তার কামনা, তার ছলনা, তার রতিরচনা থেকে মুক্তি চায় প্রসাদ; কিন্তু সে ভীতু মানুষ; আশাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য তার নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পের অন্তিমে প্রসাদকে ছিনিয়ে আনবেন আশার কাছ থেকে, ভয়ের কাছ থেকে, এবং তাকে তুলে দেবেন তার নিজেরই দুটি পায়ের ওপর, ঠেলে দেবেন কর্ম ও জীবনচঞ্চল জগতের দিকে।

গল্প শুরু হচ্ছে এভাবে—'বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।' কিছু টাকা ভূষণ পাঠাবে নদীর ধারে তার কারখানায়, প্রসাদের মারফতে। অনতিবিলম্বে আমরা জানতে পারি, 'গুমোট হয়েছে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঝড় এনে প্রসাদকে চিরদিনের মতো পালটে দেবেন, তার আভাস তিনি, লক্ষ্য করব, সচেতনভাবেই সংকুচিত আকারে উপস্থিত করছেন—গুমোট হয়েছে; এবং পরের বাক্যে 'আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল'—এটাও বলা হলো, তবু এখনো ঝড়ের ভূমিকা আমরা কিছুই অনুমান করতে পারছি না, এবং অবিলম্বে যে বলা হচ্ছে, টাকা নিয়ে নদীর পাড়ে যাবার কথা শুনে, 'বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না।'—এটা পড়েও আমাদের মনে ঝড়ের ভূমিকার কথা মনে আসে না, বরং প্রসাদের জন্যে করুণা হয়, হাসি পায়, তাকে উদ্ভট এক ন্যালাখ্যাপা বলে বোধ হয়। টাকা নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওয়ানা হয় প্রসাদ; রওয়ানা হবার আগে আশা তাকে বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।—মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর। —আশা গা ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পারো না?'

আশার এটা শয়তানী, প্রসাদকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা; আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি নেড়ে দেবার সময় ঝাল নুন তেল একটুখানি লেগে যায় প্রসাদের চিবুকে; মাঠ ভেঙে টাকা নিয়ে যেতে যেতে, ঝড়ের আগে হাওয়ার একটু একটু তোড়ের ভেতরে প্রসাদের জিভেয় সেই ঝাল তেল নুন অনুভূত হতে থাকে। আমরা সেই যে বলেছিলাম ঘটনা থেকে ঘটনায় গড়িয়ে যাবার সাবলীলতার কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এখানেই এক সুত্র পেয়ে যাই, যে, তিনি এইসব কৌশলের বলে, এইসব তুচ্ছ ও ভুলে যাবার মতো ব্যাপারগুলো দিয়ে রচনা করেন গ্রন্থি— দুই ঘটনার ভেতরে। কত সহজে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসাদের এই

মাঠ যাত্রার ভেতরে এই কাঁচা আমের সুবাদে নিয়ে আসেন অতীত ইতিহাস; আমরা জেনে যাই প্রসাদকে নিয়ে আশার খেলা। প্রসাদ বিয়ে করবে শুনে আশা বলল, 'বুঝেছি গো, আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।' অর্থাৎ আশা প্রসাদকে বলতে চাইল, সে যে বিয়ে করতে চাইছে সেটা নিতান্ত আশাকে না পাবার দুঃখে। কিন্তু এ তো সত্যি নয়; প্রসাদ তো আশাকে চায়নি; কিন্তু আশা নিজমুখে কথাটা উচ্চারণ করবার পর কোন পুরুষের না মনে হবে যে, হয়ত আমার মনের মধ্যেই কথাটা ছিল, সাহস করে বাইরে বের করতে পারিনি, এতই অসম্ভব যে নিজেই বুঝিনি।—এতবড় জটিল একটি চিন্তা মানিক বন্দোপাধ্যায় তার সচেতনভাবে স্থিরকৃত সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করেন নিরীহ এমন একটি বাক্যে—'এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে রাত্রে বাড়ি থাকবে না।' —এবং এই বাক্যটিও নিরীহ লেখকের পর্যবেক্ষণ হিসেবে নয়, প্রকাশ করেন অনুচ্চারিত কম্পিত চিন্তা হিসেবে।

আশার এই সর্বনাশা খেলায় ছটফট করে প্রসাদ— 'কোথাও চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? অজানা জগতকে সে কম ভয় করে না।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে অচিরেই আমাদের দেখাবেন এই ভয় জয় করে নেবার প্রক্রিয়া; এই ভয় জয় করাটাই এ গল্পের গল্প হয়ে ওঠার কারণ।

শুরু হয় প্রসাদের ভয় বিনাশের প্রক্রিয়া, শুরু হয় ঝড়; মাঠের মধ্যে প্রসাদ, একা, 'কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কালবৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল।' আমরা এখনো জানি না, প্রসাদের জীবনে এই ঝড় কি বিরাট ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। আমরা এখনো একটি বিপন্ন মানুষকে দেখছি যে এখন উপড়ে পড়া একটা গাছের তলায় পড়ে গেছে, গাছের ছোট ছোট ডালগুলো ঝড়ের দুলুনিতে প্রসাদের পিঠে চাবুকের মতো আঘাত করছে।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'ভয়ংকর' এক অসামান্য রচনা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপেক্ষিত একটি প্রধান রচনা এই গল্প – এবার, এই বৃক্ষপিষ্ট প্রসাদের ভেতরে লেখক এনে দেবেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন; ঝড়ের ভয়ে প্রসাদ এতক্ষণ যে মরছিল, এবার সত্যি সত্যি গাছের তলায় পড়ে প্রসাদ অনুভব করে, 'এখানে এ ভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল।—ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে।'

এর পরের বাক্যটি একই অনুচ্ছেদে একটানা লিখে গেছেন লেখক; লিখতে পারতেন আলাদা অনুচ্ছেদে, যে কোনো লেখকের পক্ষেই সেটা স্বাভাবিক হতো, কিন্তু ইনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইনি পূর্বাহ্ণেই স্থির করে নিয়েছেন সরল ও সহজ ভঙ্গীতে গল্প বলবেন, যেনবা কৌশল বিনা, তাই তিনি একটানা লিখে যান অতঃপর এই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বাক্য—যেনবা তারা চমকপ্রদ বাক্য মোটেই নয়, এ একম একটি ভান করছেন তিনি— লিখেছেন, 'মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধ প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কিনা ভেবে কিছুক্ষণ

সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে কিনা ভেবে বারবার উৎকণ্ঠায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।'

আবিষ্কার করি, এই উৎকণ্ঠা, প্রসাদের, ভয়ের নয়; নবলব্ধ সাহসের ফলে অতঃপর সে যে পা ফেলবে সেই পা কোথায় গিয়ে পড়ে, সেই পা কোথায় তাকে নিয়ে যায়, সেটা দেখারই উৎকণ্ঠা এ— এক শিল্পীর উৎকণ্ঠা তার চিত্র প্রদর্শনীর পূর্বাহ্ণে; এক কবির উৎকণ্ঠা আবৃত্তির পূর্ব মুহূর্তে; এক নবজাতকের উৎকণ্ঠা ও চিৎকার পৃথিবীতে প্রবেশ করেই। এবার বাকি শুধু ফসল তোলা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরেই যে বাক্যটি রচনা করেন তা আবারো প্রমাণ করে তাঁর ঘটনা থেকে ঘটনায় যাবার অদ্ভুত সাবলীলতা এবং এই ঘটনা থেকে ঘটনায় যাওয়া কেবল সাবলীলভাবেই নয়, গভীর অর্থপূর্ণভাবে। তাই ঝড়ের ভেতর থেকে প্রসাদ বেরিয়ে আসে, তার জীবনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে, তার ভীরুতা থেকে বেরিয়ে আসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন এই বাক্য—'শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো।' না, কাঁচা হাতের লেখা আশাবাদের প্রতীক এ আলো নয়—'হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।' ঝড়ে আটকা পড়েছে এই ট্রেন। গল্পের শেষে এই ট্রেনেই ওঠাবেন প্রসাদকে আমাদের লেখক; কিন্তু এক্ষুণি নয়, সহজে নয়। কত সহজ হতো, এখান থেকেই প্রসাদ যদি ট্রেনে চড়ে ভূষণকে ফেলে, আশাকে ফেলে, তার অতীতকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত; কিন্তু প্রসাদ এখন তার ভয়কেই কেবল জয় করেছে তা নয়, মোকাবেলা করবার সাহসও অর্জন করেছে সে একই সঙ্গে।

প্রসাদ ফিরে আসে বাড়িতে; মাঠে তার টাকাগুলো ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল, সে কথা ভূষণকে সে জানায়, ভূষণ তার দিকে তেড়ে এগিয়ে আসে, কিন্তু প্রসাদ এবং আমরা একই সঙ্গে আবিষ্কার করি, 'ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে। খানিকটা তফাতে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে।'

প্রসাদের চেহারায় যে কাদা-রক্ত তাই নয়, তার চেয়ে বড়, সেখানে এখন ব্যক্তিত্বের বিভা; অতএব আশাও এবার তাকে খেলাতে আর সাহস পায় না, সে প্রসাদকে বুকের ভেতরে টেনে নেয়; তারপর— 'প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, সাফসুফ হয় নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড় বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারোটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।' অর্থাৎ রাত বারোটার পর প্রসাদের ঘরে আশা আসবে, এই প্রতিশ্রুতি সে তাকে এই প্রথম দেয়। কিন্তু তার আগেই আশার বুকে প্রসাদ পিষ্ট হতে হতে যে অনুভব করেছে, 'ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তন' সে কথা তো আর আশা জানে না। অতএব, আশার স্নানের ঘরে তারই সাবান দিয়ে গা সাফ করে, ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাতে পেট ভরিয়ে, প্রসাদ উঠে দাঁড়ায়। ঝড় তখন কমে এলেও প্রসাদের আবার কেমন ভয় করে, খুব ক্ষীণমাত্রায়; তবে এটুকু ভয় মানুষকে বরং এগিয়েই নিয়ে যায়, পাথর করে না;

প্রসাদ পা বাড়ায়, 'তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের পরিচয় হলে ভয় তার কেটে যাবে।'

এত বড় একটা পরিবর্তন, দু'হাজার শব্দের একটি গল্পের ভেতরে, তাও প্রকৃতির একটি হস্তক্ষেপে— এবং তা বর্ণিত হয় আপাতদৃষ্টে কোনো কৌশল বিনা, নিচুস্বরে, সরল ভাষায়, সহজ ভঙ্গীতে; হঠাৎ পড়লে মনেই হয় না, এ গল্পের লেখক বাংলা কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এক শিল্পী; যেনবা কোনো সমাবেশে ঢিলেঢালা পরিবেশে দ্রুত একটি প্রায়-গুজব; এই-ই হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় কৌশল, গভীরভাবে পরিকল্পিত নির্মাণকলা। এবং যখন স্মরণ করি, 'ভেজাল' নামে গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প এটি, তখন আরো আবিষ্কার করি, মানুষকে ভেজাল মুক্ত হতে হয় তার নিজের উপলব্ধিতে, একা, এবং স্বয়ং; কোনো বাইরের মানুষ বা মানুষের তৈরী ঘটনা মানুষকে বদলাতে পারে না; বদলাবার চেষ্টা ও সম্ভাবনা থাকে বলেই মানুষ বদলায়।

পোস্টমাস্টার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন—'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না—বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন-একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে

বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত-সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়া নিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল—'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধহচ্ছে না—দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার

যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল,—'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিল কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"—বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম

অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

নিশীথে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজপাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণ বাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মতো এমনি গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু, যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ, করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে

যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ, তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত ল্যাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরব বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে গাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্‌ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধ্য হইয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর-কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্জে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্‌ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমরা স্ত্রী হারান বাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ঔষধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চয়ের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণ বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি, এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে?"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে

আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না।

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষনাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছমছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন

চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটা ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া—গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই, সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এক অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেক দিন পর ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাত ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে

চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান!"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের—মঙ্গলই হবে বোধ হয়—যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হ'য়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চ'লে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশ-ঝাড় আর বড়ো-বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু-জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ-অভিযানে তারা এসেছে—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে-মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা-জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে-নিংড়ে বার করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হ'য়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু-একটু ক'রে উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে-পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে-ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে-ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে-ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ-আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধ'রে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ একসময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঙ্কনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে-থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে—"এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।"

ব্যাপারটা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হ'য়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে-ধীরে স'রে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে ব'সে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন ব'লে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব-কিছু নিমগ্ন হ'য়ে আছে;—জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ ক'রে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে-একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে-থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনোরকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত ক'রে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হ'য়ে ধীরে-ধীরে অন্ধ হ'য়ে

যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে-ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খ'সে প'ড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য ক'রে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে-ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু-সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ ব'লে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল ক'রে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া স'রে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন একসময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা ক'রে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হ'য়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভ'রে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে ব'সে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে-ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিয়ে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রুপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতারে পার হ'য়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাৎলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বাসবার চেষ্টা করবে ও থেকে-থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হ'য়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি, সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হ'য়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে-যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "ব'সে আছেন কেন? টান দিন।"

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার

মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হ'য়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চ'লে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ ক'রে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

একসময়ে হতাশ হ'য়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুন্ন হ'য়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা ক'রে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—"কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!"

আপনাকে কৌতূহলী হ'য়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে!

যে-ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ স'রে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হ'য়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎ সামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করেছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি ক'রে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে-ধীরে বিলীন হ'য়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে-করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হ'য়ে বাইরে চ'লে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ ক'রে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত ক'রে সে যেন শেষে মরিয়া হ'য়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে-আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন—'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হ'য়ে যাবার পর থেকে আজকাল অত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না-হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার

কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা প'ড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ ক'রে ব'সে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন ব'লে ওঁর দূরসম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে ব'লে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর ব'সে সেই আশায় দিন গুনছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?"

"আরে সে বিদেশে গেছল কবে, যে ফিরবে। নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা ব'লে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা' ক'রে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মা-র কাছে বলবার উপায় তো নেই! যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!"—ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো ব'লে ফেলবেন, "চলো, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!"—ব'লে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্নকন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে ঃ "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি ব'লে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন ক'রে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হ'য়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে-ধীরে সময়ের সাগরে শিশির-বিন্দুর মতো ঝ'রে পড়েছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা ব'লে হাঁফাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে-ধীরে গ'লে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হ'য়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হ'য়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট ক'রে মেয়েটাকে যে কত

যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি ম'রেও শান্তি পাব না।"

ধরা-গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে-একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ খুলে যামিনী শুধু বলবে—"আপনার ছিপটিপ যে প'ড়ে রইল!"

আপনি হেসে বলবেন, "থাক না। এবারে পারিনি ব'লে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে এক শো না দেড় শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো ক'রে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কি না আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে-শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা ব'লে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হ'য়ে যাবে।

দিবসের শেষে

জগদীশ গুপ্ত

রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার—বাড়ির পুবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে,—গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে-সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ শিরশির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না; কিন্তু এই এতো বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই—তার চোখ-কান এ-সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাকরান জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান, রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইতো না; এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কিন্তু লোকে সে-কথা বিশ্বাস করে। দু-ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আম-কাঁঠালের কালে আম-কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারানী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এতো করিয়াও নারানীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে-যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ এক সময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে—তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারানীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই—এম্‌নি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিয়া বসিলো তাহা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য। নারানী তাহাকে হাত ধরিয়া খেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল—নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলো, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

নারানী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলো, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমিয়ে নেবে।'

'কী ক'রে জানলি?'

পাঁচু বলিলো, 'তা জানিনে।'

ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারানী প্রথমটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেলো। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলিয়াছে;—একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল; আর-একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে, পাগল ছেলে!

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিলো। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেলো তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বকশির কথাটা, অধর বকশি সে-বার নৌকা যাত্রা করিবার ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল,—প্রাঙ্গণে লাফাইয়া-লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলই চিৎকার করিয়াছিল—ও কে? ও কে? ...সে-দিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতো আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা

আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সে-দিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,—'রতি, রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।'

কথাটা বর্ণে-বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোর শাসন করিয়া দিলো, 'খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আনবি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।'

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ—নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল ছল শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই।—এই নদী, কামদা, তার দুই তীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী—চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপের শীতল নীর তাদের পল্লি-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিলো, 'আয়, নেয়ে আসি।'

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলো; মায়ের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'আমি আজ নাইবো না, মা।'

'কেন রে?'

'ভয় করছে।'

নারানী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলো, 'পাঁচু নাইবে না আজ।'

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'কেন, কী হয়েছে?'

'হয়নি কিছু।'

'তবে?'

'নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।'

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিলো, 'না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতোজনে হাসলে।'

গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চমাড়ায় ক্ষুর ঘষিতে-ঘষিতে রতি পাঁচুগোপালের উদ্ভট উক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে তো হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমির? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কী হইতে পারে! চৌধুরী বাবু বলিয়াছিলেন, 'না কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস্; কুমিরে যদি নেয় তো তোকেই নেবে— '

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, 'বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক হবে।'

হলধর রাজবংশীবাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল, 'রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ? তাতে আবার জেতে নাপিত!'

ইত্যাদি বিরক্তিকর বিদ্রূপে মনে-মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বকশির এই শ্রেণীর ভুলের দরুন সদ্য-সদ্য নিধন প্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সংকল্প করিয়া রতি বাড়ি আসিয়াছিল।

নারানী পাঁচুকে বলিলো, 'যাও, বাবা, নেয়ে এসো। সঙ্গে বড়ো একটা মানুষ যাচ্ছে—ভয় কিসের?' বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিলো। মনে-মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিলো।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছটফট করিতো; আজ সে দাঁড়াইয়া নির্বিবাদে তেল মাখিলো, এবং বাপের গামছাখানা হাতে করিয়া তার পিছন-পিছন ঘাটে আসিলো।

স্নানার্থিগণের উঠা-নামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল—তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিলো।

নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে। ...দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতো বড়ো একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।—এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কতো হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে! ...রতি শিহরিয়া উঠিলো। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলো—নদীর নিষ্কম্প বক্ষে একটি বুদ্‌বুদও কোথাও নাই।...ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দুটি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে—সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতোন! প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া দূর-দূরান্তে স্থানে-স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।—নদীর দুই তীর নির্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিলো।...

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'ওটা কী?'

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল—একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুশ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তালাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিলো, 'শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।'

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন, বাবা?'

'খাবে ব'লে।' ওরা বড়ো রুই-কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিলো না—জলের ভিতর তো অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায়?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেলো। তখন তাহার মনে পড়িলো, কামদায় কুমির ভাসিতে এ-গ্রামের কেহ কখনো দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখনও পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের?

ঝপ্ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিলো; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইলো এবং একহাতে তার ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিলো, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইলো, তারপর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলো।

রতি আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি, বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'না'।

নারানী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারানী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলো। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে-ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারানীর চোখে পড়িলো তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নাই। নারানী গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেলো। হাঁকিলো, 'পাঁচু?'

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধহয় এক দৌড়ে বাড়ি যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ির সীমানার বাহিরে যাইতে পারে নাই। মায়ের ডাক শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়োসড়োভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্তি দেখিয়া নারানীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিলো।

ব্যাপার এই—

নারানী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা ছোটো একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইয়াছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার ঠিক পদ্ধতিটা জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ়রসে

সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধুলায় গড়াগড়িও দিয়াছে; কাজেই ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা।

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলো।

পাঁচু মার খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেলো—এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদের এবং নারানীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেলা। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা তেমনি তার—হয়েছে কী?'

নারানী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো!'—বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা হ'লে তো হবে?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিলো—সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিলো। রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা আমার ঘট?'

উভয়েই ফিরিয়া দেখিলো, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিলো, 'নিয়ে আসি, বাবা?'

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।...মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্বা ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে-দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিলো।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।... জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।

কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।

ভয়ংকর
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অসময়ে সহর থেকে টাকা এসেছিল, কারখানায় পৌঁছে দেবার জন্য ভূষণ দত্ত প্রসাদকে ডেকে সাতশো তেইশ টাকা দিল। চার মাইল দূরে বিরূপা নদীর ধারে ভূষণের মস্ত চামড়ার কারখানা। কাজ শেষ হবার পরেও আজ সকলে সেখানে ধন্না দিয়ে থাকবে, কিছু কিছু টাকা অন্তত সকলকে আজ দেওয়া চাই। নইলে কাল কেউ কাজে আসবে না। রাস্তা ধরে বীর-গাঁ হয়ে কারখানায় যেতে অনেক সময় লাগে, রেললাইন ডিঙিয়ে পেনোর মাঠ পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে প্রসাদ কারখানায় পৌঁছে যাবে।

গুমোট হয়েছে। আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল। বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না?

বলা দূরে থাক, ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।

মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাসবুনানি কদমকেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড় বড় গহ্বর দুটি কাঁচা-পাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মতো জোরালো নয়। ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্তে তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'আজ্ঞে না, যাচ্ছি।'

গেরুয়া রঙের ছোট টাইট জামাটি গায়ে দিয়ে সে টাকাগুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে পকেটে রাখল। এতটুকু দায়িত্ব নিয়েই নিজেকে তার বিপন্ন অসহায় মনে হচ্ছে। আশাকে ইসারায় ডাকতে দেখে আরেকবার বুকটা তার কেঁপে গেল।

'জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।'

'মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর!'—আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পার না?'

চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জল দাঁত সবসময়েই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এইরকম শুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।

রাস্তার মোড়ে বসাকদের মন্দির। সামনে দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের মানুষ-সমান উঁচু চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রসাদ প্রার্থনা জানাল, আজ যেন ঝড় না ওঠে, আর—আর, তার যেন সুমতি হয়।

আশার সুমতি হোক এই প্রার্থনা জানাবার ভরসা তার হয় না, আশার মনে পাপ আছে মনে করলেও তারই পাপ হবে। আশা ভূষণের স্ত্রী, আশা গুরুজন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে পায়ে হাত দিয়ে আশাকে সে প্রণাম করেছিল।

আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি ধরে নেড়ে দেবার সময় ঠোঁটে আঙুল

ঘষে গিয়েছে। চলতে চলতে প্রসাদ ঝাল নুন-তেলের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে চোখে তার জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। এ-বিপদ ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো অসম্ভব। সুমতি না ছাই জাগবে তার, আশা কাছে এসে দাঁড়ালে ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে, সত্য সত্যই আশা যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায়?

আশা যে কেন এমন হয়ে গেল কে জানে। মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধূকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে অথবা কার সুখশান্তি-ভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কমবয়সী, কুমারী, বোকাটে ধরনের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে-কোনো ঘরোয়া মেয়ে হলেই তার চলত। কিন্তু তার জন্য যে-কোনো মেয়েই বা কে খুঁজে দিচ্ছে। জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরীব, মেয়েটি চলনসই, সুতরাং সুলভ। তিন দিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, 'সে তো আমাদের ভাগ্যি।'

তাকে দিয়েই প্রসাদ আবেদন পাঠালে ভূষণের কাছে। ভূষণ উদারভাবে বলল, 'তা করুক না বিয়ে, বিয়ে করবে তাতে আর হয়েছে কি!'

দুপুরবেলা তাকে ঘরে ডাকিয়ে সোহাগের কৌতুকে আশা বলল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে? মাগো মা, কোথায় যাব!'

সলজ্জভাবে একটু হাসলেও প্রসাদ মুখ নিচু করল না। আশাকে দেখতে দেখতে গভীর স্বস্তি বোধের সঙ্গে তার মনে হতে লাগল, তার বৌ এরকম হবে না, সুন্দর রোগা প্যাটকা চেহারা তার বৌ-হবু মেয়েটার। তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ-লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু! মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে!

তবে কেমন যেন প্রাণহীন মানুষ, জড় পদার্থের মতো, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়েচেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।

মুচকে হেসে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'

সেই থেকে এইরকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে রাত্রে বাড়ি থাকবে না।

কোথাও চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে! অজানা অচেনা জগতকে সে কম ভয় করে না। ছোটোখাট ফরমাশী কাজ করে, সাবধানে খেয়ে দেয়ে শরীরটা ভালো রেখে কোনো রকমে এখানে মাথা গুঁজে সে টিকে আছে। দুর্বল শরীর, এতটুকু অনিয়মে অসুখ হয়। লেখাপড়াও ভালো জানে না, কোনো কাজও শেখেনি। অপরিচিত নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে দুদিনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পেনোর মাঠের মাঝখানে ভীরু প্রসাদকে ঝড় ধরে ফেলল।

পরপর কদিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এলোমেলো বাতাসও উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিও নামেনি, ঝড়ও ওঠেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ উড়ে বাতাস পড়ে গিয়েছে, দিগন্তের কোলে শুধু চোখে পড়েছে ঘনঘন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক। প্রসাদ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল, আজও যেন তাই হয়। নেহাৎ যদি খারাপ হয় তার

অদৃষ্ট, শুধু যেন বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজলেই তার সর্দিকাশি হবে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে জ্বর এসে হয়তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে নিম্যুনিয়ায়, ভূষণের সেজ শালার মতোই হয়তো চারদিনের দিন অচেতন হয়ে সাতদিনের দিন খটখটে জ্যোৎস্নার রাত্রে অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মরে যাবে, তবু মাঠে একা ঝড়ের মধ্যে পড়ার চেয়ে তাও অনেক ভালো।

আকাশে ধূসর কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে দুরুদুরু বুকে প্রসাদ জাম পাড়ছিল, দূর থেকে ঝড়ের সোঁ-সোঁ আওয়াজ কানে এলো কারখানার দিক থেকে। ন্যাকড়ায় বাঁধা জামের পুঁটুলি পকেটে ভরে সেদিকে পিছন ফিরে প্রসাদ ছুটতে আরম্ভ করল। কোনোমতে পেনোর মাঠ পার হয়ে রেললাইন ধরে স্টেশনে পৌছে যদি আশ্রয় নেওয়া যায়। দুশো গজ দৌড়ালেই প্রসাদকে হাপরের মতো হাঁপাতে হয়, সুতরাং হাঁপ ধরবার আগেই বাতাসের প্রথম ধাক্কায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে বসা মাত্র ধুলো আর বালিতে দুটি চোখ যেন তার অন্ধ হয়ে গেল। একটা শুকনো ঝাঁকাটির চারা গড়িয়ে এসে তার গায়ে আটকে গেল, শুকনো পাতা তার গায়ে মাথায় ক্ষণিকের জন্য লেপটে থেকে ছিটকে উড়ে যেতে লাগল, একটা শুকনো ডাল কোথা থেকে এসে লাঠির মতো আঘাত করল তার ঘাড়ে! তারপর নামল বৃষ্টি। ঝড়ের শক্তি আর কলরব যেন দশগুণ বেড়ে গেল। দুটি বুড়ো আঙুল দুকানে ঢুকিয়ে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে প্রসাদ তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জীবনে কখনো সে ঝড়ের মূর্তি চেয়ে দ্যাখেনি। ঝড় উঠলে সে ধরের কোণে মুখ গুঁজে চোখ কান বন্ধ করে থাকে, মাঝেমাঝে মুখ দিয়ে বার হয় ভয়ের ওঁ-ওঁ কাতরানি। কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কালবৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল। বৃষ্টিধারাকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গায়ে তার প্রচণ্ড বেগে ঝাপটা মারতে লাগল ক্রমাগত, চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবে ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ। একটা কিশোর তেঁতুল গাছ গুঁড়ির কাছে মটকে ভেঙে আছড়িয়ে পড়ল, ডগার সরু সরু ডালপালাগুলি অসংখ্য চাবুকের মতো একসঙ্গে আঘাত করল প্রসাদের পিঠে। সেই মুহূর্তে ঠিক মাথার উপরের অবনত আকাশে প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল বজ্র।

তখন ধীরে ধীরে প্রসাদ উঠে বসল। অন্ধ ভয়ে মনে মনে সে মুহুর্মুহু: মরছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় জাগায় তার খেয়াল হয়েছে যে এখানে এভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল। এত জোরে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল যে মাথাটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবু বমির বেগ ঠেকানো গেল না, দুহাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। এমন হাল্কা মনে হতে লাগল নিজেকে যে শুকনো পাতার মতো বাতাস যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্ত দুহাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর উঠে দাঁড়ানো মাত্র বাতাসের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কি না ভেবে কিছুক্ষণ সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌছতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকায় গিয়ে পৌছতে পারবে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় বারবার তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে প্রবল হাসিকান্নার আবেগে প্রসাদের দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেই অগভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকু তার দুঃখ হল না, আঘাতের বেদনাও অনুভব করল না। নিজের সঙ্গে সে যেন তামাসা করছে এমনি ভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে হাসতে লাগল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগে সস্নেহ পরিহাসের ভঙ্গিতে ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের

গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে বলল, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে, ছুটতে গেলি কেন?' হামা দিয়ে খাদের গা বেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার ট্রেনের আলোর দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

প্রকাণ্ড একটা গাছ ভেঙে পড়ে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। একটি থার্ডক্লাস কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রসাদ মরমে মরে গেল। একগাড়ি লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জামা কাপড় তার কাদা আর রক্তে মাখা-মাখি হয়ে গেছে, না-জানি কী ভাবছে সকলে তাকে দেখে! কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধ, ভিতরে অসহ্য ভ্যাপসা গরম। প্রসাদের দম আটকে আসবার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি অপর দিকের দরজা খুলে সে লাইনে নেমে গেল।

বাড়িতে পৌছানোমাত্র ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পৌছে দিয়েছিস?'

'আজ্ঞে না।'

ভূষণ কটমট করে তার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে।'

এক পকেটে ন্যাকড়া বাঁধা জাম ছিল, অন্য পকেটে ভূষণের রুমালে বাঁধা সাতশো তেইশ টাকা। জামগুলি ছেঁচে গেছে, রুমাল সুদ্ধ টাকাগুলি কখন কোথায় পড়ে গেছে ভগবান জানেন। পেনোর মাঠেই কোথাও পড়েছে, সে যখন আছাড় খাচ্ছিল অথবা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল।

থাবা উঁচিয়ে ভূষণ তার দিকে এগিয়ে আসে, ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করে দেয়। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ভূষণ তাকে মারবে! খালি পেটটা গুলিয়ে উঠে আবার তার বমি ঠেলে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে মাথার কাঁপুনি শুরু হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে ভূষণের মস্ত গোলগাল মুখখানা পাশাপাশি দুদিকে লম্বা হয়ে যায়।

কাছে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেই ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে, খানিকটা তফাতে থেমে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে! তাকে মারবার জন্য এগিয়ে এসে ভূষণের ভয় হয়েছে!

'পেনোর মাঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া যায় ভালোই, নইলে তোকে পুলিশে দেব।'

ভূষণের ধমকে ঝাঁঝ নেই, এ যেন শুধু কথার কথা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এসে প্রসাদের মূর্তি হয়েছে ভীতিকর, তার লাল চোখের ভয়ার্ত চাউনি দেখে বুক কেঁপে ওঠে। আশার সখের আলমারিতে বসানো প্রকাণ্ড আয়নায় প্রসাদ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, অনুমান করে প্রথমে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর ধীরে ধীরে জাগল উল্লাস, নিজেকে ভূত সাজিয়ে গুরুজনকে আঁতকে উঠতে দেখলে ছোট ছেলের যেমন উন্নাস জাগে সেইরকম, কিন্তু ঢের বেশী প্রচণ্ড ও উৎকট।

তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। সে টের পাচ্ছে রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দুপা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরও ভয় পাবে, আরও সংশয় ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরও নরম গলায় কথা বলবে, হয়তো দুপা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ? এত সহজে সে ভয় পায়?

কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্তগুলি প্রসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকেলেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তার সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভাণ করে বলে, 'পড়ে গেলে কি করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আরেকটু হলে। তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে?'

ভূষণ ভয়-বিস্ময়ের ভাণ করে সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'গাছ চাপা পড়েছিলে? খুব বেঁচে গেছ তো!'

তখন বিজয়ী বীরের মতো প্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আশা তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'মাগো মা, একি?'

ন্যাকড়ায় বাঁধা ছ্যাঁচা জামগুলি দেখিয়ে প্রসাদ বলল, 'আপনার জন্য পেড়েছিলাম।'

আশা চাপা গলায় বলল, 'সত্যি?'

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্টোভ জ্বেলে আশা রাঁধছে ভূষণের নৈশভোজনের মাংস। ঘরের মধ্যে গন্ধ আর গরমের অসহ্য সমন্বয়। গায়ের জামা সেমিজ সে খুলে ফেলেছে, ঘামে ভিজে সিদ্ধ মাংসের মতো তার মেটে চামড়া হয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে। 'একটাও ভালো নেই?' বলে মুখে পুরবার উপযুক্ত জাম খুঁজতে সে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের আলগা আঁচলটিও তার খসে পড়ল, মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল রিঙে বাঁধা একরাশি চাবি।

প্রসাদ চোখ বুজতে চায়, বুজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে সে-আনন্দ তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে গড়া কাঁধ, বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

গভীর আলস্যে হাই তোলার মতো মুখের ভঙ্গি করে আশা বলল, 'মরণ তোমার! বাড়ী ভরা লোক নেই?'

তবু সে তাকে বুকে চেপে ধরে রাখল আরও খানিকক্ষণ। ছোটছোট কটা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তার মুখে বুলিয়ে, হলুদ রঙীন আঙুলে তার কপালের এলোমেলো চুল সরিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলে মাঠে? খুব লেগেছে?'

বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মতো সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে! ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশি নয়। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা-কপাল কুটে সে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃৎপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল। প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।'

আশার স্নানের ঘরে গোলাপের গন্ধ, একটানা, অনিবার্য, জমজমাট গন্ধ। তিন আনা দামের একটি সাবানে এত গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়, গোলাপের আরক কত সস্তা। মনটা প্রসাদের আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যু ভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মতো অন্যের চটচটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়। ঘষে ঘষে সাবান মেখে প্রসাদ স্নান করল। রান্নাঘরের এক কোণে বসে ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাত পেট ভরে খেয়ে নিল। ঝড়বাদল তখন অনেকটা কমে এসেছে। প্রসাদ সদরে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ভয় দেখাতেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বাতাস হঠাৎ প্রবল হয়ে চারিদিকে সাঁ-সাঁ রবে শব্দিত হয়ে উঠল। প্রসাদের নবলব্ধ সাহসও এতক্ষণে অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বাতাস অনেকটা শান্ত হয়ে এলে সে পথে নেমে গেল। রেললাইনে এখনো ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। লাইন পার হয়ে যে-পথে পেনোর মাঠ থেকে সে পালিয়ে এসেছিল সেই পথে ভূষণের দামী বড় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলল। টাকার পুঁটুলিটা খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে। নয়তো স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, যে-কোনো দিক থেকে, প্রথমে ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে! তবে তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের পরিচয় হলে, ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান-টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বৌ-ও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণ-যৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?